KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No KLMLGK 200	Place of Publication : ৫৮/১২৮ (নচ্চ সাদুর্লিন, কলি-৪৫
Collection KLMLGK	Publisher কিরিটি ভট্টাচার্য
Title অন্যদিন (ANYADIN)	Size 8.5"/5.5"
Vol & Number 18-19 21 22 23	Year of Publication : ১৩৮১ Dec - March 74-75 ১৩৮২ ১৩৮২ Jan - March 1976
	Condition : Brittle Good
Editor কিরিটি ভট্টাচার্য	Remarks

C.D. Rol No KLMLGK

কবিতা কেন্দ্রিক ত্রৈমাসিক

অন্যদিন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদক
শিশির ভট্টাচার্য

শরৎ সংখ্যা ১৩৮২ ● একবিংশ সংকলন

এয়ার-ইণ্ডিয়া আপনাকে প্রতি সপ্তাহে দিচ্ছে পঁয়ষট্টিটি ফ্লাইট—৫টি মহাদেশে

ইওরোপ

ইওরোপের জন্যে সপ্তাহে ১৩টি ফ্লাইট

লণ্ডন? আপনার জন্য নয়টি ৭৪৭ বিমান সারিবন্দী তৈরী। এর মধ্যে তিনটি তীব্র গতিতে উড়ে যায় শুক্রবারে আর শনিবারে আর মঙ্গলবারে। অন্য ছটি আপনার ইচ্ছেমত রোম, প্যারিস কিম্বা ফ্রাঙ্কফার্ট হয়ে যায়। মস্কো? তার জন্যে দুটি ৭০৭ বিমান।

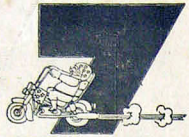

নিউইয়র্ক

নিউইয়র্কের জন্যে প্রতি সপ্তাহে ৭টি ফ্লাইট

একটি ৭৪৭ বিমান ছাড়ে প্রত্যেক দিন। যায় মধ্য প্রাচ্য আর ইওরোপ হয়ে। আমাদের বিশেষ এক্সকার্সান ফেয়ারের সুবিধা অনুসারে সফর করলে নিউইয়র্ক গিয়ে ফিরে আসার ভাড়া সাধারণ এক তরফের ভাড়ার চেয়ে কম পড়ে।

মধ্যপ্রাচ্য

মধ্যপ্রাচ্যে প্রতি সপ্তাহে ২২টি ফ্লাইট

বেরুট? তার জন্যে পাঁচটি ৭৪৭ বিমান প্রস্তুত। কুবৈত? আপনার পছন্দমত চারটি ৭৪৭ বিমান আর ছটি ৭০৭ বিমান। দুবই যেতে চরিটি ৭০৭ বিমানের যে-কোন একটিতে চলে যান। বহরেন আর মস্কাতের জন্যে তিনটি ফ্লাইট আর আবু ধাবী, কায়রো কিম্বা তেহেরানের জন্যে দুটি ক'রে ফ্লাইট। এছাড়াও এডেন দোহা কিম্বা দহরানের জন্যে একটি ক'রে ৭০৭ বিমান।

এসব ছাড়া প্রতি সপ্তাহেঃ
জাপানে ৬টি ফ্লাইট হংকং হয়ে—
৪টি টোকিওতে
আর ২টি ওসাকাতে।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়
প্রতি সপ্তাহে ১০টি ফ্লাইট
৬টি ব্যাংককে আর
৪টি সিঙ্গাপুরে।
অস্ট্রেলিয়ায় ২টি ফ্লাইট
পূর্ব আফ্রিকায় ৩টি ফ্লাইট
মরিসাসে ২টি ফ্লাইট

এয়ার-ইণ্ডিয়া
আপনার প্রিয় এয়ারলাইন

AI: 9084

অন্যদিন

TAPAS DHARAI
67/5, Seven Tanks Estate
COSSIPORE CLUB
CALCUTTA-700002

অবৈতনিক সম্পাদক ঃ শিশির ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ জীবন সরকার

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

অন্যদিন প্রধানত তরুণ গোষ্ঠীর ত্রৈমাসিক কবিতাকেন্দ্রিক মুখপত্র। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক জীবনধর্মী গল্প, কবিতা ও আলোচনা সাদরে গৃহীত হবে। চিঠির উত্তর পেতে হলে অনুগ্রহ করে ডাকটিকিটযুক্ত নাম ঠিকানা লেখা খাম পাঠাবেন।

●

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস, ক'লকাতা-৪৫
ফোন ৪৬-৩৭১৪।

●

সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন, ক'লকাতা-৬ থেকে হরিপদ পাত্র কর্তৃক মুদ্রিত ও শিশির ভট্টাচার্য কর্তৃক ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস ক'লকাতা-৪৫ থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদশিল্পী ঃ কমল সাহা, প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ ইম্প্রেশন হাউস ঃ ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, ক'লকাতা-৯

দাম ঃ দেড় টাকা

দুর্মদ জাহানকোষা আজ অতীতের স্মৃতি

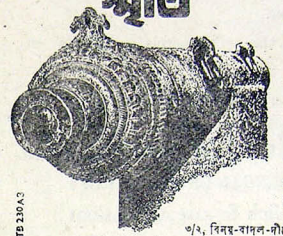

জাহানকোষা। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সেরা হাতিয়ার। আজ অতীত গৌরবের স্মৃতিমাত্র। অতীতের মুর্শিদাবাদ—ঐশ্বর্য আর বিলাসের লীলাভূমি। যেখানে অতুলনীয় দেশপ্রেম আর ঘৃণ্যতম ষড়যন্ত্র একই সঙ্গে পাশাপাশি চলেছে সমান গতিতে। এখানে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র স্মৃতিসৌধ, যা আপনাকে মনে করিয়ে দেবে নবাবী বাঙলার গৌরব-গাঁথা আর তার পতনের বেদনাময় ইতিহাস। এছাড়াও আজকের মুর্শিদাবাদে আপনি পাবেন অতীত ঐতিহ্যের স্মারক সূক্ষ্ম কারুকার্যে অসাধারণ হাতির দাঁতের জিনিস পত্র আর সিল্কের শাড়ি। আজই চলুন মুর্শিদাবাদ। দেখে নিন নবাবী আমলের গৌররোজ্জ্বল স্মৃতি। রাত্রিবাসের জন্যে রয়েছে বহরমপুর ট্যুরিস্ট লজ। সেখানে পাবেন আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য আর আরাম।

বিশদ বিবরণের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ
ট্যুরিস্ট ব্যুরো
৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ডালহৌসি স্কোয়ার) ঈষ্ট, কলিকাতা-১
ফোন : ২৪-৮২৭১, গ্রাম : TRAVELTIPS
স্বরাষ্ট্র (পর্যটন) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

TCP/TB 239 A3

পশ্চিম বাংলার তাঁতবস্ত্র

আমাদের গর্ব আর আনন্দের জিনিষ

পশ্চিম বাংলার তাঁত শিল্প তার রেশম ও সূতীর বিরাট বস্ত্রসম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। বয়ন বৈচিত্র্যে আর উৎকর্ষতায় পশ্চিম বাংলার তাঁত বস্ত্রের তুলনা নাই।

পশ্চিমবঙ্গ তাঁত ও বস্ত্রশিল্প অধিকার কর্তৃক প্রচারিত

Small entrepreneurs in West Bengal should take full advantage of the following facilities offered by W. B. S. I. C.

(a) Financial assistance on easy terms for the procurement of indegenous and imported raw-materials.

(b) Accommodation in the Industrial Estates with infrastructural facilities.

(c) Accommodation in the Commercial Estates at nominal rent.

(d) Supply of scarce categories of raw-materials.

The West Bengal Small Industries Corporation Ltd.

(A GOVT. OF WEST BENGAL UNDERTAKING)

6A, Raja Subodh Mullick Square, (3rd floor)

Calcutta-13

শিশুর মুখে হাসি ফোটাতে

ছোট পরিবার গড়ে তুলুন

***

আজই যে কোন পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা কেন্দ্রে

গিয়ে ছোট পরিবার সম্পর্কে খবর নিন।

বিজ্ঞাপন সংখ্যা—333/75-76 পঃ বঃ পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা থেকে প্রচারিত

সম্পাদকের কথা

নতুন পর্যায়ে 'অন্যদিন' শরৎ সংকলন প্রকাশিত হল। অর্থাৎ পূর্বঘোষণা মত কবিতার সঙ্গে গল্প, প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনার ডালি নিয়ে 'অন্যদিন' পাঠক-পাঠিকা ও সাহিত্যিক বন্ধুদের সামনে হাজির হচ্ছে। নতুন পর্যায়ে বললেও 'অন্যদিন'-এর মূল চরিত্র অপরিবর্তিতই থেকে যাচ্ছে ; কারণ এখনও 'অন্যদিন' মূলতঃ কবিতা পত্রিকাই থাকল। আরো ভালোভাবে বলতে গেলে এখন থেকে 'অন্যদিন' হল একটি কবিতাকেন্দ্রিক ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা।

এই শরৎ সংকলনটি যতটা সম্ভব যত্ন নিয়ে সাজাতে চেষ্টা করা হল। পছন্দ অপছন্দ যাচাই করার ভার কবি—সাহিত্যিক বন্ধুজন ও পাঠকের ওপর।

শিশির ভট্টাচার্য

প্রকাশিত হলো

রণজিৎ দেব-এর

উত্তরবঙ্গের চিঠি (১০'০০) ১ম খণ্ড

এই খণ্ডে আছেঃ উত্তরবাংলার আদিবাসী, কুচবিহারের রাজবংশাবলী, ভাষা, বর্ণ, উচ্চারণরীতি, গম্ভীরা, গোরখনাথ ও ভাওয়াইয়াগণ, বনজ ও চা সম্পদ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিচার ব্যবস্থা, মদন মোহন জল্পেশ, বাণেশ্বর শিবমন্দির, কুচবিহারের রাসমেলা ও দেবীপূজা প্রভৃতি।

ভূমিকাঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী।

ভারতী প্রকাশনী
৮/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতাঃ ১২

॥ প্রকাশিত হোচ্ছে ॥

বহু বিতর্কিত তরুণ কবি
জীবন সরকার-এর

এই আলোয় এই হাওয়ায়

শ্লোক কবিতা প্রকাশনী
প্রেস ইমপ্রিন্ট, ৩৭৫, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা
কলকাতাঃ ৭০০০৩৪

ভালোবাসার কবিতা

জীবন সরকার ও ইন্দ্রজিৎ বসু সম্পাদিত এই দশকের অনবদ্য কবিতা সংকলন বেরিয়েছে। ঝকঝকে ছাপা, সুন্দর বাঁধাই। এখনও সংগ্রহ করে প্রিয়জনকে উপহার দিন।

এই সংকলনে লিখেছেন—প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুশীল রায়, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, শিশির ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে।

শরৎ সংখ্যা ১৩৮২
একবিংশ সংকলন

অন্যদিন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদকীয়

শিশির ভট্টাচার্য

প্রবন্ধ

সন্তোষকুমার অধিকারী
পঙ্কজ সিংহ
পল্লব সেনগুপ্ত

গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র
সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
জীবন সরকার
সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা

অর্ণবজ্যোতি দেব * অপরাজিতা গোপ্পী * অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায় * অমিত চক্রবর্তী * অসিতবরণ হালদার * অরুণ ঘোষ * ইন্দ্রজিৎ বসু * কবিরুল ইসলাম * কার্তিক মোদক * কুমারেশ চক্রবর্তী * ক্ষিতীশ দেব শিকদার * গৌরীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় * গৌতম দাশগুপ্ত * তারাপদ রায় * দীপক কর * দীপক সরকার * নচিকেতা ভরদ্বাজ * নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য * পলাশ মিত্র * প্রণব মাইতি * প্রমোদ বিকাশ ভট্টাচার্য * প্রদীপ রায়চৌধুরী * প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ * বিনোদ বেরা * বিপ্লব চন্দ * বিশু মুখোপাধ্যায় * বেণু সরকার * মঞ্জুষ দাশগুপ্ত * রমেন্দ্রনাথ মল্লিক * রামপ্রসাদ মল্লিক * শাশ্বতী দেব * শুভ্রা চক্রবর্তী * সমরেশ মণ্ডল * সমীর চট্টোপাধ্যায় * সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত * সন্তোষ দাস * সুশীল রায় * সুচেতা মিত্র *

সুদক্ষিণা মিত্র * সুধীর সরকার * সুশীল পাঁজা * সুধাংশু বাগ * সৈয়দ হাসমত জামাল * সৌম্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় * স্বপন ঘোষ * স্বপন চক্রবর্তী * স্বদেশ রঞ্জন দত্ত * শিশির ভট্টাচার্য।

বিদেশী ভাষা থেকে

আমেরিকা

এমিলি এলিজাবেথ ডিকিনসন

অনুবাদ ঃ দেশ ভাটিয়া

রাশিয়া

ম্যারগারিতা আলিয়ার

অনুবাদ ঃ শ্রীঅসিত সরকার

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে

হিন্দী

সুবাস কুমার

অনুবাদ ঃ আনন্দ দাশগুপ্ত

ধুমিল

অনুবাদ ঃ সমীর চক্রবর্তী

আলোচনা

অশোক মণ্ডল

বরুণ মণ্ডল

পান্নালাল সরকার

সুনীল হাজরা

চিঠিপত্র

দিগন্ত সমঝদার

কবি-পরিচিতি

পশ্চিম দিনাজপুর

কবিতার খবর

সন্তোষকুমার অধিকারী

যতীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার অজানা একটি অধ্যায়

১৯৪৭ সালে নোয়াখালির মহাশ্মশানে বসে মহাত্মা গান্ধী যখন পাকিস্তানী হিন্দু সমাজের প্রাণ ও মর্যাদা রক্ষার সংকল্প নিয়ে সাধনায় বসেছেন, আমি তখন বহরমপুরে। গান্ধীর প্রতি কিছুটা বিরুদ্ধতার ভাব মনে ছিল। অথচ সেই মুহূর্তে গান্ধীজির ভূমিকা মহামানবজনোচিত বলে মনে হ'ল। আমি নতুন করে গান্ধীচর্চায় মগ্ন হ'লাম।

যে বইটি আমাকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করলো, সেটির নাম মাইণ্ড্ অব মহাত্মা গান্ধী'। গান্ধীজির ভাষণ থেকে সযত্নে সংকলিত ক'রে লেখা গান্ধী-বাণীর অভিধান এই বইটি। ১৯৪৭ সালে এই বইটি পড়ার পর আমি লিখেছিলাম গদ্যকাব্য—'একলা চল রে…'।

একদিন আলোচনা হচ্ছিল লালদীঘির ধারে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বাড়ীতে বসে। স্বল্পভাষী কবি প্রকাশ করে না বললেও বুঝতে দিয়েছিলেন, যে, গান্ধীজির অনুরাগী তিনি নন। আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম 'মাইণ্ড্ অব্ মহাত্মা গান্ধী' পড়তে। কবি বইটি পড়েছিলেন এবং তারই ফলশ্রুতি গান্ধীবাণী কণিকা'। গান্ধীজির অমূল্য বাণীকে কাব্যে রূপ দিলেন কবি যতীন্দ্রনাথ। এক মহামানবের জীবনদর্শন আর এক অসাধারণ কবির প্রতিভায় কাব্যময় হ'য়ে উঠ্‌লো। এই দুর্লভ কাব্যকণিকাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলেন বহরমপুরের উমানাথ সিংহ। কিন্তু সাহিত্যের বৃহত্তর অঙ্গনে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি অপরিচিতই থেকে গেল। কোন সমালোচকের হাতে এর মূল্যায়ন হ'য়েছে বলে আমার জানা নেই।

কবি হিসেবে যতীন্দ্রনাথ শুধু প্রতিষ্ঠিত নন, তাঁর কাব্য সে-যুগে জীবনবাদী মানুষের কাছে প্রেরণার উৎস ছিল। বাংলা সাহিত্যের রাজপথে

যখন রবীন্দ্রনাথের মহারথ ছুটে চলেছে তখন কোন কবিই রবীন্দ্র প্রভাবকে অস্বীকার করে দাঁড়াবার সাহস করতে পারেন নি। মোহিতলাল বলিষ্ঠ কণ্ঠে দেহবাদের স্তুতিতে দার্শনিকতার রঙ মিশিয়ে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কল্লোল যুগের কবিসমাজকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন নি। তানপুরা আর সারেঙ্গির ক্লাসিক পরিবেশে সেই যুগে হঠাৎ মেঠো বাঁশীর সুর নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন যতীন্দ্রনাথ। আবির্ভাব ঘটলো তাঁর ছোট্ট একটি কবিতা পুস্তিকা হাতে যার নাম 'মরীচিকা'। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের আদর্শে সমগ্র জগৎ ও জীবনকে আনন্দময় করে তুলতে চাচ্ছেন। তিনি তখন লিখে চলেছেন—

"আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তিনি আনন্দিত—তাই আমার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত, আমার রক্ত প্রবাহিত, আমার চেতনা তরঙ্গিত।" জীবনদেবতাকে জীবনে নিত্য নব নব রূপে তিনি দেখে চলেছেন। তখন হঠাৎ যতীন্দ্রনাথ এলেন এক উদ্ধত প্রতিবাদের সুর নিয়ে। বাঁশের বাঁশিতে গাওয়া সে সুর মৃদঙ্গ পাখোয়াজের আওয়াজে চাপা পড়ে থাকে নি। বরং সেদিনের দরিদ্র, জীবনযন্ত্রণায় ক্লান্ত, হতাশাপীড়িত মানুষের মনে এক নতুন প্রতিবাদকে মুখর করে তুললো। কবি যতীন্দ্রনাথের লেখা কয়েকটি পংক্তি সে যুগে অনেকেরই মুখে মুখে ফিরতো—

তব জয় জয় গাহিলো দ্যুলোক, আলোক পাইলো লোক,
শুধাই তোমারে, কি আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ।
চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পারো
গোবি সাহারার বুকে?

'মরীচিকা', 'মরুশিখা' ও 'মরুমায়া' পরপর এই তিনটি বই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করলো নতুনের কবি হিসেবে। কবি যেন চ্যালেঞ্জ করলেন রোমান্টিক যুগের গরিমাময় আশাবাদকে। দেবতার প্রতি নির্ভরতাকে তিনি তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্রূপ করলেন—

তুমি শালগ্রাম শিলা
ওঠা বসা যার সকলি সমান
তারে লয়ে রসলীলা।

তাঁর কবিতার চরণ বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদের কাছেও মন্ত্রের মত কাজ করেছিল। তারা আবৃত্তি করতো—

কে গাবে নূতন গীতা
কে ঘুচাবে এই সুখ সন্ন্যাস
গেরুয়ার বিলাসিতা?

সকলে তাঁকে অভিহিত করেছিল 'দুঃখবাদের কবি' বলে। তিনি আশাবাদকে পরিহার ক'রে দুঃখের তত্ত্বকে আঁকড়ে ধরেছেন। অনেকে তাঁকে নাস্তিক বলতেও দ্বিধা করেন নি; কিন্তু আসলে যতীন্দ্রনাথ দুঃখবাদী ছিলেন না, ছিলেন জীবনবাদী। জীবনের প্রত্যক্ষ বেদনার রূপকে তিনি দুচোখ ভরে দেখেছিলেন। জীবন যে শুধু আনন্দের, হাসিতে এবং সৃষ্টির মহত্ত্বে পরিপূর্ণ নয়, একথাই তিনি সোচ্চার কণ্ঠে বললেন। এবং কঠিন ও নির্মম নিয়তিকে স্বীকার করলেন। তিনি দেখলেন, 'বৌবাজারের মোড়ে/ যখন ফুলের দোকানের পাশে কসাই মাংস থোড়ে...' নিবিড় বেদনায় উচ্চারণ করলেন—

মোর চেয়ে কেবা জানে
হাতুড়ী পেটার পূর্বে লোহারে
আগুনে দেওয়ার মানে?

প্রত্যেকদিন সকালে তাঁকে দেখতে পেতাম। লালদীঘির পাশের গলি থেকে বেরিয়ে দীঘির পাশ দিয়ে বড় রাস্তা পার হ'য়ে আবার মাঠে নামতেন। সোজা মাঠ পার হ'য়ে এসে উঠতেন গ্রান্ট্ হলের সামনে। ওখান থেকে রিক্সা ধরতেন, কাশিমবাজার যেতে হবে। বহরমপুরের হাজার হাজার লোক সেদিন জানতো না যে, ওই নিঃশব্দ অতি সাধারণ মানুষটি এক অসাধারণ কবি। অথচ বহরমপুরের প্রায় সকলেই চিনতো কবি মণীশ ঘটককে।

একই গলিতে পাশাপাশি দুটি বাড়ী। মাঝখানে একটুকরো খালি জমি। একটি বাড়ীতে সবসময় ভিড় এবং আড্ডা। আর একটি বাড়ীর জানলাগুলিও বন্ধ; পাছে ওই ভিড়ের চিৎকার ঘরে আসে। ইনকাম ট্যাক্স এগজামিনার মণীশ ঘটককে যেমন সবাই চেনে, এঞ্জিনিয়ার যতীন্দ্রনাথকে তেমনই কেউই জানে না। তিনিও কাউকে জানাতে চাইতেন না। কখনো কোনো সভাতেও যেতে চাননি।

তবু যতীন্দ্রনাথকে আসতে হ'য়েছিল আড্ডাতে। সে আড্ডা সাহিত্যের

আড্ডা। আর সে আড্ডায় সেদিন যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক অন্নদাশঙ্কর রায়, এবং কাঁদির মুন্সেফ অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত। তাঁরা মিলিত হতেন পূর্ণিমা সম্মেলনীতে। 'পূর্ণিমা' নামে একটি পত্রিকাও তাঁরা বার করেছিলেন। সম্পাদক ছিলেন যতীন্দ্রনাথ।

'মাইণ্ড অব্ মহাত্মা গান্ধী' পড়ে অভিভূত হ'লেন কবি। ঠিক সেই সময়েই নোয়াখালিতে চলেছে তাঁর পদযাত্রার সাধনা। নোয়াখালি থেকে দিল্লীতে ফিরে গেলেন গান্ধী। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি তিনি নিহত হলেন গডসের হাতে।

'মাইণ্ড্ অব্ মহাত্মা গান্ধী' থেকে গান্ধীবাণী বেছে বেছে তিনি অনুবাদ করছিলেন। হয়ত নিছক খেয়ালে, হয়ত এক মহামানবের চিন্তাধারায় অভিভূত হ'য়ে। দ্বিতীয়টিই সত্যি। গান্ধীজির মহান মৃত্যুতে তিনি যে অভিভূত হ'য়েছিলেন তার প্রমাণ 'গান্ধীবাণী কণিকা'র প্রথম কবিতাটিই ঃ

তুমি এলে সেই শ্যামসুন্দর
মানুষে করিলে ব্যাধ,
মৃত্যুশায়ক হানি' সে গোপনে
পুরাল পাশব সাধ।
ছুটে এসে পাশে সে কী দেখিল সে !—
ধূলায় লুটাও রাম,
বাণ বেঁধা বুক, হাসিমাখা মুখ,
বলে গেলে ক্ষমিলাম।
বাণ বেঁধা বুকে হাসিমাখা মুখে—
সে শুধু 'হে রাম' বলি'
সাষ্টাঙ্গের প্রণামে প্রণমি'
ধূলায় পড়িল ঢলি।'

কিন্তু মৃত্যুর মহানুভবতায়, এ কথা কবি ভুলে যান নি। তাই গান্ধীর টুকরো টুকরো কথাগুলি তাঁর হাতে কাব্যচেতনায় দীপ্ত হয়ে উঠলো।

আমি জানিয়াছি পথ,—
সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কটময় খরধার অসিবৎ
সত্যের বিধি মানি শুধু আমি,
সত্যই মোর প্রাণ,

সত্য ভিন্ন নাহি সেবি আমি
আর কোন ভগবান।

উল্লেখ করা যেতে পারে, যে, যতীন্দ্রনাথের যৌবনের ঈশ্বর বিদ্রোহ তাঁর পরিণত জীবনে 'সায়ম'-এর আশ্রয়ে এসে এক শান্ত সৌন্দর্যে মণ্ডিত হ'য়ে উঠেছিল। তাই গান্ধীর পরিপূর্ণ ঈশ্বরমগ্নতার ছবিকে তুলে ধরতে তাঁর দ্বিধা হয়নি।

সত্য ও প্রীতি ধর্ম ও নীতি
অভীতি আমার হরি,
জ্যোতির জ্যোতি ও প্রাণাতীত তিনি
রয়েছেন প্রাণ ভরি।

অথবা—

যে দুঃখ আর যে নৈরাশ্য
পড়ে মোর চোখে নিত্য,
ভাগ্যে আপনি ভগবান মোর
ভরিয়া আছেন চিত্ত,—
নহে, হারাইয়ে জ্ঞান
উন্মাদ হ'য়ে জাহ্নবী জলে
কবে ত্যজিতাম প্রাণ।

গান্ধীজির জীবনানুভবের সঙ্গে কোন এক অগোচর মুহূর্তে কবি যতীন্দ্রনাথের জীবন চেতনা এক হ'য়ে মিশেছিল। গান্ধীর বাণী উদ্ধৃত করে তাই তিনি লিখলেন—

দেখি ধ্বংসের স্তূপে
নিরবচ্ছেদ জীবনের ধারা
বহি চলে চুপে চুপে।

[ক্রমশঃ]

পঙ্কজ সিংহ

মাঘের পরব, শিকের পরব

ইতিহাসের পাতা ওল্টালে সহজেই নজরে পড়ে অনেক অধ্যায় জুড়ে ক্ষত্রিয় সমাজের আধিপত্য। রামায়ণ, মহাভারতের মতো সুপ্রাচীন কাব্যেও অতি নিখুঁতভাবে বর্ণিত আছে ক্ষত্রিয় রাজাদের প্রতাপ, রাজ্যশাসন আর সংস্কৃতির সঠিক মূল্যায়ন। সেদিক থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত ক্ষত্রিয় জাতি প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত জাতি।

বর্তমানে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় যদি অনুসন্ধান চালানো যায় তাহলে দেখা যাবে, এই ক্ষত্রিয়দের অধিকাংশই বসবাস করেন বাঁকুড়া জেলায়। বাঁকুড়ার ক্ষত্রিয় রাজাদের কাহিনীও সর্বজনবিদিত। অন্যান্য সব জেলাতেই কম বেশী ক্ষত্রিয়প্রধান গ্রাম বা অঞ্চল দেখা যায়, তাহলেও বাঁকুড়া তন্মধ্যে প্রধান। লক্ষ্যণীয় বিষয় যেখানে ক্ষত্রিয় পরিবারের বসবাস সেখানে তাদেরই আধিপত্য সর্বাধিক। তাদের বংশধরেরা কেউ ছিল রাজা, কেউ জমিদার, একবাক্যে তাদের আর একটি পরিচয় তারা যুদ্ধবাজ তারা বীর। সে কারণে আজও লোকসমাজে ক্ষত্রিয় জাতিকে "রাজার জাত" নামে আখ্যা দেয়।

বলাবাহুল্য এই জাতি বর্তমানে বাঙ্গালী সমাজের অন্তর্গত, কিন্তু আদৌ এঁরা বাঙ্গালী নন। গভীর অনুসন্ধান থেকে প্রমাণিত পশ্চিম বাংলায় যতগুলি ক্ষত্রিয় পরিবার আছে তাদের পূর্ব-পুরুষদের প্রত্যেকেই রাজপুতানা/বিহার/পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী। এই জাতি "রাজপুত" নামেও পরিচিত। পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারে এদের আধিপত্য, অর্থনৈতিক অবস্থা আজও গর্বের বস্তু। পশ্চিম বাংলায় এরা মনে-প্রাণে বাঙালী হয়ে গেলেও এদের মিশ্র সংস্কৃতি বাঙালী সমাজ থেকে এদের কিছুটা দূরে সরিয়ে রেখেছে। এদের লোকাচার/বিবাহ, উৎসব কোনও কিছুই পশ্চিম বাংলার বাঙালী সমাজের মতো নয়, বিহারকে যদি ক্ষত্রিয়বহুল রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত

করি তাহলে দেখা যাবে বিহারের ক্ষত্রিয় সমাজের সংস্কৃতির সঙ্গে এদের পার্থক্য অনেক। অভিন্ন জাতির ভিন্ন সংস্কৃতিতে গড়ে উঠেছে একটি নতুন মিশ্র সংস্কৃতি যার প্রবর্তক পশ্চিম বাংলার বাঙালী ক্ষত্রিয়েরা।

এঁদের উপাধি সাধারণত "সিংহ" বা "সিং"। অনেকে ইংরেজ আমলের প্রভুদের দেওয়া খেতাব পেয়ে ব্যবহার করেন "সিংহবাবু" "সিংহরায়", বাবু "অমুকপ্রসাদ সিংহ" ইত্যাদি। তাছাড়া হাজারী, শেখর এইসব উপাধিও ব্যবহার করেন।

এই জাতি কোন কারণে পশ্চিম বাংলায় এসে রাঢ়ের বাঁকুড়া জেলাতেই ব্যাপকহারে বসবাস আরম্ভ করল তার সঠিক তথ্য আমার জানা নেই। এটা হতে পারে সেখানে অন্য জাতির মধ্যে প্রধান হচ্ছে "বাউরী" জাতি। এরা ক্ষেত মজুর শ্রেণী। স্বভাবতই এদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার উন্নতমানের নয়, এবং অঞ্চলটি শুষ্ক, পাথুরে ও বনাঞ্চলময়। যেহেতু "বাউরী" ভিন্ন অন্য কোনও জাতির প্রাধান্য ছিল না, সে কারণেই ক্ষত্রিয়েরা এই পরিবেশকে চিহ্নিত করেছিল তাদের অবাধ রাজত্ব চালাবার।

প্রসঙ্গক্রমে যে কথাগুলি এসে গেল সেকথা না বললে হয়ত এই জাতি সম্বন্ধে অনেক কথাই অজ্ঞাত রয়ে যেতো অনেকের কাছে। আসল কথায় আসা যাক। পৌষের শেষে প্রকৃতি সাজায় মাঘের বরণডালা। শূন্য মাঠের কোল বেয়ে বেজে ওঠে ক্ষত্রিয় সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোকপার্বণ "শিকের পরবে"র (শিকার) মাতাল করা মাদল মাঘের সূচনার সেই দিনটিতে। পৌষের পরোক্ষ অর্থই সুখের দিন। তারিখটি পয়লা মাঘ তাহলেও পৌষের গন্ধেই মাতোয়ারা, এই দিনটি চিহ্নিত করা হয় "একেন শিকের" বা "শিকের পরব" নামে। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে পার্বণের দিনটি নিঃসন্দেহে সুদিন।

'শিকের' কথাটি 'শিকার' শব্দেরই বিকৃত রূপ। শিকার করে আনা এমন পশুপাখিই শিকের উপাধি পায়। কিন্তু এখন শিকের বলতে বোঝায় কেবল খরগোসকে। এ শব্দ বাঁকুড়া/বীরভূমের লোকেদের এক পরিচিত শব্দ।

আগের দিন পৌষ সংক্রান্তি, তুসুপরবের দিন। পুণ্যস্নান, উন্মত্ততার মধ্যে তুসুগান, তুসুর ভাসান, পৌষমেলা এইসব নিয়েই দিন পরিপূর্ণ, যেহেতু বাঁকুড়া জেলায় বাউরী সম্প্রদায়ের বাস অধিক সে কারণে তুসু

গানের পাল্লা কম জমে না, কারণ এই গানের প্রধান কর্ণধার ক্ষেত-মজুর সম্প্রদায়।

পয়লা মাঘের প্রভাত থেকেই শিকের পরবের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ক্ষত্রিয়দের যে পরিবার গ্রামের মধ্যে প্রতাপশালী সেই পরিবারের কর্তাই হন এই পরবের নায়ক। বংশপরম্পরায় এই একই নিয়ম চলতে থাক। বলা-বাহুল্যে শিকের পরবের কর্তাকে অবশ্যই রাজবংশীয় হতে হবে। পূর্ব পুরুষদের কেউ রাজা অথবা জমিদার না থাকলে সেই বংশের কোনও উত্তরাধিকারী এই পরবের কর্তা হতে পারে না।

দেখা গেছে যেখানে একের অধিক জমিদার বাড়ী বা ওই জাতীয় বংশ অতীতে একই গৃহস্থ ছিল বর্তমানে পৃথকভাবে বসবাস করে, সেক্ষেত্রে ওই সব গৃহস্থের কর্তাকেও এই পরবেব কর্তা হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। সে কারণে অনেক জায়গায় একাধিক কর্তার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় শিকের পরব।

নিয়ম অনুসারে জেলে ভোর রাতে বাবুদের নিজস্ব পুকুর থেকে মাছ ধরে সেই বাড়ীর কর্তার দরজায় একটি মাছ নামিয়ে দিয়ে আসে যিনি হবেন শিকের পরবের কর্তা। নাপিত এসে বাবুকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দেয়। রাজাদের এই সব নাকি নিয়ম ছিল। তিনি ঘুম থেকে উঠেই দরজা খুললে প্রথমেই দেখতে পাবেন মাছটিকে। লোক প্রবাদ আছে কোথাও কোনও কাজে যাওয়ার সময় যদি মাছের মুখ দেখে যাওয়া হয় তাহলে সে কাজে সফলতা অর্জন করে। দিনটি যাতে শুভ হয় সেই কারণেই এই ব্যবস্থা। এরপর স্নান সেরে রাজপোষাক পরার নিয়ম। বর্তমানে রাজত্ব বিলোপ হয়ে যাওয়ায় রাজপোষাকের পরিবর্তে ভালো জামা কাপড়েই নিয়ম রক্ষা হয়। এরপর আহার। যে-কোনও খাবার সেদিন খেতে নেই, দই-চিড়ে দিয়ে ফলার হয়। গৃহিণীরা কপালে এঁকে দেয় দই-হলুদের ফোঁটা। দই-চিড়ে, দই-হলুদের ফোঁটা, প্রবাদ মতে সবই মঙ্গলের প্রতীক। এর থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট যে এই পরবে গৃহিণীরা প্রত্যক্ষভাবে অংশ না নিলেও পরবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তাদের যত্নের ত্রুটি থাকে না।

এরপর সকলে হাজির হয় পৈত্রিক দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণে। রাজা বা জমিদারদের দেবতার মন্দির থাকা একটা সাধারণ ব্যাপার! এসে হাজির হয়

গ্রামের ক্ষেতমজুর এবং তথাকথিত শূদ্রজাতীয় যারা আছে তারাও। এরা সবাই এই সিংহবাবুদেরই প্রজা। বর্তমানে জমিদারী মৌজা না থাকলেও সহানুভূতির দৃষ্টিকোণ থেকে ভূতপূর্ব প্রজারা মন্দির প্রাঙ্গনে হাজির হয় বাবুদের শিকের পরবের সাহায্য করতে। সঙ্গে থাকে লাঠি, বর্শা, তীর ধনুক ও অন্য অন্য অস্ত্র, যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় এমন বাজনা। প্রচুর লোক সমাগমেও স্থানটি থাকে শৃঙ্খলাপূর্ণ। প্রত্যেকেই নীরব থেকে প্রতীক্ষা করে আর এক মাঙ্গলিক চিহ্নের জন্য। এই মাঙ্গলিক চিহ্নটি হলো শঙ্খচিল। শোনা যায় ক্ষত্রিয়দের এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য দৈব আশীর্বাদের মতো মন্দির প্রাঙ্গণের চত্বরে উড়ে যায় শঙ্খচিল। সমস্ত স্তব্ধতাকে ভেঙে তখন একযোগে চিৎকার করে ওঠে সকলে। বাজনা বেজে ওঠে সজোরে। দলবেঁধে রওনা হয় বনের পথে সবাই।

এখানে সবাই বীর, হাতে অস্ত্র, বুক টানটান। সামনে থাকেন রাজবংশের সেই প্রতিভূ। এই পরবে ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি ব্যবহার করার রীতি ছিল আগে। এখন পায়ে হেঁটেই এসব সমাধা হয়। এদের উন্মত্ততায় মুখর হয় বন। পশুপাখীরা প্রমাদ গুণতে থাকে। শুরু হয় অভিযান। যে-কোনও বন্য পাখী যে-কোনওভাবেই হোক শিকার করা হবে। খরগোসের উপর ঝোঁক থাকে বেশী। খরগোস ধরার কাজে ব্যবহার করা হয় লম্বা লম্বা জাল। প্রথমেই যা শিকার করা হয় তাকে বলা হয় "রাজশিকের"।

প্রথা অনুসারে প্রাসাদের লোকেরা এইসব লোকেদের জন্য বনেই খাবার নিয়ে আসবে। নিয়ম রাখতে গ্রামের ক্ষত্রিয় যুবকেরা প্রতিটি ক্ষত্রিয় পরিবার থেকে যথাসাধ্য ভালো ভালো খাবার সংগ্রহ করে বনে নিয়ে যায়। সেখানে তৃপ্তি করে আহারপর্ব শেষ করা হয়।

শিকার করে যখন সবাই ঘরে ফেরে তখন সূর্য অস্তাচলে যায়। শিকার পেলে মহা আনন্দে হৈ হুল্লোড়ের মধ্যে সব গাঁয়ে আসে। আনন্দে ধুলো-মাটিকেও তোয়াক্কা করে না। সঙ্গে থাকে সেই গুড়ুগুড়ু বাজনা।

প্রথম শিকার হওয়ামাত্র ঘরে খবর পাঠিয়ে দেয় লোক মারফৎ। মেয়ে মহলে আনন্দের বন্যা বয়। গভীর প্রতীক্ষায় বসে থাকে বীর স্বামীকে সানন্দে ঘরে তুলবে বলে। সেদিন অধিক রাতে পরব শেষ হয়। ক্লান্ত শরীর, যে যার ঘরে চলে যায়।

যদি কোনও শিকার না পায় তাহলে কেউই ঘরে ফেরে না। লজ্জায় বনেই

অজ্ঞাতবাস করতে হয়। এখন অবশ্য কেউ বনে থাকে না। অধিক রাত্রে গ্রামে আসে চোরের মতো নিঃশব্দে।

পরের দিন সেই মন্দির প্রাঙ্গণে বাবুদের খরচায় রান্না হয়। প্রধান খাবার থাকে শিকারের মাংস। নিয়ম হচ্ছে গতরাত্রেই এ সবের আয়োজন করা। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত শরীর নিয়ে তা আর হয়ে ওঠে না। সে কারণেই পরের দিন এই ব্যবস্থা হয়। এখন এসব উঠে গেছে। সকলে শিকারের মাংস ভাগ করে নিয়ে যে যার ঘরে চলে যায়।

রাজা রাজত্ব আজ সবই বিলুপ্ত। জঙ্গল মহলও সরকারী সম্পত্তি। তবুও ক্ষত্রিয়দের অতীত গৌরব টিকিয়ে রাখতে এখনও বাঁকুড়ার অনেক ক্ষত্রিয়প্রধান জায়গায় অনাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় এই 'শিকের পরব"। অন্য অন্য জেলার ক্ষত্রিয়েরা ঐ ১লা মাঘের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে ওইদিন নিরামিষ খায় না। যার যেমনই অবস্থা হোক অবশ্যই মাংস ভাত খাবে। এই হলো ক্ষত্রিয়দের জাত পরব "শিকের পরব"।

বড়বাজারের "সিংহগড়ে"র মতো কিছু পরিবারের মধ্যে এখনও এই জাতীয় অবলুপ্ত আভিজাত্য, সামাজিকতা, প্রতিপত্তি খুঁজে পাওয়া গেলেও বিপর্যস্ত জনজীবনে এদের লোক উৎসবকে কিছুদিন পর আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

———

পল্লব সেনগুপ্ত

কৃষ্ণলীলা

আর্জিটা মঞ্জুর হয়ে গেল এই যুক্তিতে ঃ যেহেতু ওঁরা বিবাহিত দম্পতি নন, সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে একই কোবালায় রেজেস্ট্রি করা সম্পত্তি হলেও, আইনের চোখে সেটা দুই অংশীদারের মধ্যে সমান ভাগে বিভক্ত ; অতএব জমির ঊর্ধ্বতন সীমা নির্দেশ করে যে সরকারী হুকুমনামা চালু হয়েছে কিছুকাল আগে, সেটা এই ভূসম্পত্তির ওপর প্রযোজ্য হতে পারে না।

বিবাদীপক্ষের উকিলের এই যুক্তিতে হাকিম-সাহেব না সায় দিয়ে পারলেন না। সুতরাং সরকার পক্ষের উকিলবাবুর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও এই মর্মে রায় বেরোল ঃ যেহেতু রাধা এবং কৃষ্ণ আইনের চোখে দুই ভিন্ন পরিবারভুক্ত ব্যক্তি এবং যেহেতু ব্রহ্মপুর মৌজার মানিকচক থেকে শিমুলবাগান পর্যন্ত ২৯ একর জমি তাঁদের উভয়ের নামে নবাবগঞ্জ মহকুমার সদর আদালতে বিধিমতে রেজেস্ট্রিকৃত, অতএব ঐ সম্পত্তি 'জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ-সীমা'— সম্পর্কিত আদেশের আয়ত্তাধীন নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

রায়টা জারী হবার পর ভক্ত সেবাইতরা আনন্দে মশগুল হয়ে নামকীর্তন করতে করতে আদালত-কক্ষ ছেড়ে যথাস্থানে রওনা হলেন দল বেঁধে। সঙ্গে গেলেন একগাল পান এবং হাসিমুখে ওঁদের উকিল হারাধন বসু। ভালই সম্বর্ধনাটা হবে ওঁর! জব্বর যুক্তিখানা দাখিল করেছেন বটে!

চুপচাপ বসে থাকেন সরকারী উকিল নিরঞ্জন চাকলাদার। এমন একটা গোছানো-মামলা এভাবে ফেঁসে যাবে, এটা ওঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আচ্ছা, জমিটা যদি রাধাকৃষ্ণের বদলে হরপার্বতীর মন্দির ট্রাস্টের হতো, তাহলে নিশ্চয় মামলাটায় এভাবে ডিগবাজি খেতে হতো না? কিংবা রামসীতার? কিংবা, লক্ষ্মীনারায়ণের? এক মামলার হার থেকে শিক্ষা পেয়ে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সব মামলার ব্রিফ মনে মনে সাজাতে বসলেন

নিরঞ্জনবাবু। বিচক্ষণ ব্যক্তি ত বটেন!

কিন্তু, উঁহু! এত সহজ তো নয় ব্যাপারটা। ধরা যাক, হরিপুরের দুর্গা মন্দিরের সঙ্গে দেবোত্তর জমিটাকে সিলিঙের অর্ডিন্যান্সের আওতায় ফেলে মামলা করা হল। তখনও কেসটা এই ছকে সাজানো চলবে?

উকিল-সাহেবের প্রত্যয় হল, তা চলবে না। মা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ত একা নন সেখানে, দুই সাবালক ছেলে এবং বিবাহিতা দুই মেয়েও সে সম্পত্তির অংশীদার। এখন সেবায়েতরা যদি আগে ভাগেই এফিডেভিট করে বসে এই মর্মে যে, দুই ছেলেই আলাদা হয়ে গেছে বাপ-মায়ের সংসার থেকে এবং দুই মেয়ের নামেও তাদের ভাগের সম্পত্তি লিখে দেওয়া হচ্ছে; তারপর বাকি যেটুকু থাকছে, সেটুকুই তাদের জননী দুর্গা ঠাকুরুণের তথা পিতা শিব ঠাকুরের খাস দখলে।

সর্বনাশ! এই রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের মামলার রায়ের ফলে দিব্যচক্ষু খুলে যায় যদি আর সব মন্দিরের সেবায়েতদের, তাহলে ত সবাই এই সব পাঁচ রকম প্যাঁচ কষে অর্ডিন্যান্সটাকেই বানচাল করে দেবে। শিবের মন্দিরের সম্পত্তির অংশীদার নন্দী-ভৃঙ্গীকে ত করবেই, ষাঁড়টাকে করলেই বা ঠেকাচ্ছে কে? মায়, ভূত-প্রেতদের ভাগ্যও যে খুলে যাবে না এ বাবদে, তাই বা কে বলে? কালীমায়ের সম্পত্তির বখরা করা হবে একগাদা ডাকিনী-যোগিনীর নামে, আর হিন্দুস্থানীদের গণপতি-মন্দির যেটা আছে রসুলপুরে, তার সম্পত্তির অংশীদার আর কাউকে না পেলেও, গণেশের বাহনটি ত আছে। আইনের ব্যাখা অনুযায়ী ত সেও গণেশের পরিবারভুক্ত নয়। বড়লোকের বাড়ির ড্রাইভারকে কি ফ্যামিলি-মেম্বারের স্ট্যাটাস দেয় আইন?

প্রচণ্ড রাগ হতে লাগল প্রবীণ ব্যবহারজীবী নিরঞ্জনবাবুর! রাগটা আসলে হয়েছে মামলায় হেরে যাবার ফলে; যদিও, সেটা মনে মনে স্বীকার করতেও ওঁর ভ্যানিটিতে বাধছে। অতএব অর্ডিন্যান্সের মূল উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে যাবার সম্ভাবনায় একজন সরকারী উকিল হিসেবেই তিনি উদ্বিগ্ন এবং সে জন্যেই ক্রুদ্ধ, এই কথা ভেবেই সান্ত্বনা পেতে চাইলেন উনি!

আচ্ছা, রায়ে যে বলা হল রাধা এবং কৃষ্ণ স্বামী-স্ত্রী নন, প্রেমিক-প্রেমিকা মাত্র, আর সেই কারণেই তাঁদের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক নেই বলেই সম্পত্তির মামলাটা এভাবে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে, এর পরিণতিই বা কতোদূর গড়ায়?

প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক, অর্থাৎ এই প্রেম ব্যাপারটাই তাহলে বে-আইনী বলে মানতে হবে ত, না-কি? প্রেম ব্যাপারটাই আইনবিরুদ্ধ হলে প্রেম-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ই ত তবে ইনজাংশ্যান জারী করে প্রচার বন্ধ করে দেওয়া যায়! দি আইডিআ—এইবার দেখি বাবাজীদের মনোহরশাহী কেত্তন গেয়ে কেমন সেলিব্রেশ্যান হয় কালকে! কালই এই লাইনে মুভ করে ঐ কীর্তন গানের ওপরই ইনজাংশ্যান জারী করিয়ে আনতে হবে ফাস্ট আওয়ারে! উকিলবাবু মাথার ভেতরে একটা স্বস্তি বোধ করলেন এতক্ষণে!

কিন্তু এ প্রপঞ্চময় সংসারে মায়াবন্ধ জীব-জীবনে স্বস্তি কতক্ষণের! পদ্মপত্রে নীর—এইসব কি সব বলেছেন না সেকালের কর্তারা? তা, উকিলবাবুর স্বস্তিও হল ক্ষণস্থায়ী। মুনি-ঋষিরা ত আর মিথ্যে বলেন নি।

প্রেমের ওপর ইনজাংশ্যান না-হয় জারী করালেন উনি এই মামলার নজীর দেখিয়ে, কিন্তু তার ন্যাচারাল কনসেকোয়েন্স হিশেবে যা-যা ঘটবে, সেগুলোর সবই তো কিছু সুফলপ্রসূ হবে না তাঁর নিজেরই পক্ষে। এক-নম্বর, কোর্ট থেকে 'প্রেম' শব্দটাই যদি আইন বিরুদ্ধ বলে দেওয়া হয়, ত প্রথম বিপদে পড়বেন খোদ ডি, এম, প্রেমময় মহলানবীশ; ওঁকে নিশ্চয়ই এফিডেভিট করে নিজের নাম পাল্টাতে হবে। ডি, এম, হয়ে ত আর বে-আইনী কাজের অংশীদার হতে পারেন না। কিন্তু আচমকা এভাবে বাপ-ঠাকুর্দার দেওয়া নাম বদলাতে হলে উনি নিশ্চয়ই বিরক্ত হবেন খুব, আর সেই বিরক্তির মূল কারণ হবেন উকিলবাবু। অতএব……? ঘামতে শুরু করলেন ভদ্রলোক।

দু-নম্বর পরিণতিটাও কম বিপদের নয়। মেজ মেয়ে টুকু কলেজে পড়তে পড়তেই খাতির জমিয়েছে যে ছোকরার সঙ্গে, জামাই হিশেবে সে অবশ্য খুবই লোভনীয়। পাশ-ফাস বেশি করেনি বটে, অর্ডিনারি বি, এস, সি—চাকরিটাও খুব কিছু আহা-মরি নয়, তবে সরকারী দপ্তরে পাকা কাজ; কিন্তু বাড়ির অবস্থাটা! বাপের এক ছেলে, শহরের ওপরে তিনখানা বাড়ি, সদর বাজারের ওপর অমন ফাঁদালো কাপড়ের ব্যবসা, মঙ্গলপুরের ওদিকে জমি-জমাও বিস্তর (তবে সিলিঙ বাঁচিয়ে, সে খবর নেওয়া আছে উকিলবাবুর) —কাজেই সুপাত্র অবশ্যই। এখন তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে কোর্ট থেকে হুকুম জারী করালে, প্যাঁচে পড়ে যাবে খোদ নিজের মেয়ে এবং হবু জামাই। বে-আইনী কাজের দায়ে অ্যারেস্ট-ফ্যারেস্ট করালেই বা প্রথমে ঠেকাচ্ছে কে?

শত্রুর ত অভাব নেই, এত বচ্ছর ওকালতি হল, কেউ গিয়ে একবার লাগালেই চিত্তির। তা ছাড়া ঐ পাত্রের দিকে নজর আছে অনেকেরই। এ সব ঝামেলা সত্যি-সত্যিই যদি ঘটে, এবং তার উপলক্ষ হন স্বয়ং তিনি, তা হলে কি ছেলের বাপ আর রাজি হবেন টুকুকে বৌ করে ঘরে তুলতে? তখন কি হবে ব্যাপারটা চিন্তা করারই সাহস হল না উকিলবাবুর। অমন পাত্র ফস্‌কে যাবে, মেয়েটার অন্যত্র বিয়ে দেওয়া খুবই মুস্কিল হবে—এত জানাজানি হয়ে গেছে ঘটনাটা; সর্বোপরি এই পাত্র হাতছাড়া হয়ে গেলে গৃহিণীর কাছে যে লাঞ্ছনা হবে ওঁর সেটা কল্পনাও করা যায় না! ডাকসাইটে বাঘা উকিল হলে কি হবে, বৌকে খুবই ভয় পান মনে মনে! কেই বা না পায়!

আরে সর্বনাশ! এটা ত এতক্ষণ খেয়াল হয়নি। খোদ গিন্নীর নামই প্রেমতারা! তাহলে……নাঃ, প্ল্যানটা ভেস্তেই গেল। রাধা-কৃষ্ণ মন্দিরের ট্রাস্টি বোর্ডের কর্তাদের জব্দ করার এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ বেরিয়ে গেল।

কিন্তু সব কিছুরই দুটো দিক থাকে। এ মামলার নজীর টেনে আর কিছু করা না গেলেও, যোগেযাগে একবার টুকুর বিয়েটা ওখানে দিয়ে ফেলতে পারলে, তারপর এই নজীর দেখিয়েই বেয়াইকে সম্ভবত রাজি করিয়ে ফেলা যাবে ছেলে-বৌয়ের নামে মঙ্গলপুরের সম্পত্তিটা আগে-ভাগে লিখে দেওয়ার জন্যে। বেনামী করার চেয়ে নিজের ছেলে-বৌয়ের নামে সম্পত্তি রাখা আজকাল অনেক বেশি নিরাপদ! তারপর দরকার পড়লে কোর্টে ডিক্লারেশ্যন দিলেই চলবে, ছেলে-বৌ ভিন্ন হয়ে গেছে বাপের পরিবার থেকে।

আঃ চমৎকার। মামলাটায় হেরে আখেরে ভালই হয়েছে তা হলে। এভাবে সমস্ত ব্যাপারটা গুছিয়ে তুলতে পারলে মেয়েটার ব্যাপারেও নিশ্চিন্দি, আর প্রেমতারারও মাথা ঠাণ্ডা।

তবে ঐ রাধাকৃষ্ণ মন্দির ট্রাস্টকেও ছাড়া হবে না। মাথায় ফন্দি খেলতে থাকে নতুন করে। হয়েছে!

কোর্ট থেকে বলে দিয়েছে যে, রাধা ঠাকরুণ এবং কেষ্ট ঠাকুরের মধ্যে কোনো আইনগত বা সামাজিক সম্পর্ক নেই। তাহলে ওঁরা যে এক বাড়িতে, মায় এক ঘরে দিনরাত কাটান, এটা কি ছেলেপুলেদের সামনে দুর্নীতির নমুনা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না? এই মর্মে দরখাস্ত করানো হয় যদি কাউকে দিয়ে, তা হলে তার ভিত্তিতেই কোর্ট থেকে অর্ডার বের করানো যাবে এমন মর্মে যে, যেহেতু রাধাকৃষ্ণ বৈধ স্বামী-স্ত্রী নন, সুতরাং এভাবে একঘরে রাত কাটানোটা তাঁদের

পক্ষে ঘোরতর নীতিবিগর্হিত কাজ, অতএব সামাজিক সুরুচি রক্ষার স্বার্থে মন্দিরের ট্রাস্টিদের কর্তব্য হচ্ছে ওঁদের আলাদা-আলাদা ঘরে রাখা। সেক্ষেত্রে দুটো আলাদা ফ্ল্যাট হিশেবে গণ্য করা যাবে।

এইবার! খুব ত কেত্তন হচ্ছে, আর মোচ্ছবের তোড়জোড় চলছে! এবারে বোঝ্‌ ব্যাটারা ঠেলা কাকে বলে! তোল্‌, একগাদা খরচা করে আলাদা ফ্ল্যাট, ইয়ে, মন্দির! ভাগের সম্পত্তি যেমন, তেমনি ভাগের বসতবাড়িও কর, হতভাগারা! হুঁ, কেত্তন হচ্ছে আবার!

পরম তৃপ্তিতে বাড়ি ফেরেন মাদারীপুরের ডাকসাইটে গভর্ণমেণ্ট প্লীডার সাহেব। ব্রিফগুলো বাইরের অফিস ঘরের টেবিলের ওপর রেখে, দোতলার সিঁড়ির মুখে যেতেই……

বাঘের মুখে। ইয়ে, প্রেমতারার। সবে সন্ধ্যেবেলার পুজোটি সেরে তিনি নামছেন। হাতে চরণামৃতের ছোট পেতলের ঘটি। স্বামীর দিকে নিয়ম-মাফিক ক্রুদ্ধ চোখে একবার তাকিয়েই প্রেমতারা সিঁড়ির দু-ধাপ ওপরে দাঁড়িয়ে পড়ে ঘটিটা একটু উঁচু করে তুলে কাত করলেন……

ঢক ঢক্‌ করে আল্‌গোছে চরণামৃত পান করতে করতে উকিল সাহেবের মনে পড়ল যে প্রেমতারার নিত্যদেবতার নামও রাধাকৃষ্ণ।।

——

প্রেমেন্দ্র মিত্র

উচ্চশির

সকাল বেলা কামাখ্যা ডাক্তারের সঙ্গে রুইদাসের একচোট হয়ে গেল। 'বলি কেমন ধারা ভেজাল বড়িগুলো দিচ্ছো ডাক্তার, এক মাস হয়ে গেল জ্বর আর গেল নি। কুলাইন টুলাইন কিছু নাই বুঝি—খালি নিমপাতা বাটা।'

রুইদাসের কথাবার্তা বরাবরই একটু বেয়াড়া। অন্য দিন হলে কামাখ্যা ডাক্তার তাই কিছু গায়ে মাখত না। কিন্তু আজ চাল কলের খোদ মালিকের ভাগনে ও ম্যানেজার বনোয়ারী লাল স্বয়ং এসেছে তার ডিসপেন্সারীতে পেটের দরদের ওষুধ নিতে। এই সময় এইরকম বেফাঁস কথায় কার না রাগ হয়। কামাখ্যা ডাক্তার দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল, 'পছন্দ না হয়, ত নিমপাতা নিজে বেটে নিলেই পারিস। আসিস কেন বেটা।'

'ব্যাটা ব্যাটা করো নি ডাক্তার। রুইদাস রাগলে কাকেও পরোয়া করে না, জানো!'

'জানি জানি, ভারী আমার লেভেল ক্রসিং-এর জমাদার, তার আবার তেজ দেখ না। যা যা ব্যাটা এখানে তোর ওষুধ মিলবে না।' কামাখ্যা ডাক্তার টেবিলের ওপর থেকে হাত বাড়িয়ে রুইদাসের হাত থেকে ওষুধের পুরিয়াটা সত্যিই ছিনিয়ে নিলে।

রুইদাস প্রথমটা কেমন ভ্যাবাচাকা হয়ে গেছল, পরের মুহূর্তেই একবারে ফেটে উঠে পড়লো। 'দেখলে সবাই তোমরা দেখলে ঃ চামার ডাক্তারের ব্যাভারটা!'

'হাত থেকে ওষুধটা জোর করে কেড়ে নিলে।' রুইদাসের রাগটা, যেন এবার হতাশকান্নায় মেশানো।

'তা কেড়ে নিবে নি?' কাঠের গোলার ভরত এবার ডাক্তারের খোসামুদি করবার একটু সুযোগ পেয়ে ফোড়ন ছাড়লে, 'ডাক্তারের উপর ভক্তি-ছেদ্দা নেই তো ওষুধ নিতে আসা কেন? আবার বলা কিনা, নিমপাতা বাটা।'

'তো? নিমপাতা বাটা বলবে নি, কুইলাইন থাকলে একমাসের জ্বর একটু

বাগ মানে না।'—কথাটা তেজের হলেও রুইদাসের স্বর অনেকটা নরম। হাতে পায়ে ধরা ছাড়া আর যে করেই হোক এখনও ওষুধটা ফিরে পেলে সে নেয়।

কিন্তু বনোয়ারীলাল হাওয়াটাকে আবার গরম করে তুললে, 'আরে কোথাকার লবাব তুমি হে, কুইলাইন লিতে আসছো, কুইলাইন লাট-বেলাট বলে পায় না। চার আনায় উনি কুইলাইন খরিদ করতে আসিয়াছেন।

বনোয়ারীলালের কথায় সবাই হেসে ওঠার সঙ্গে রুইদাসের রক্ত আবার মাথায় উঠে গেল।

'কেন চার আনা পয়সা কি পয়সা নয়, যে ফাঁকি দিয়ে নেবে। কুইলাইন না থাকবে ত এ জুয়াচুরীর ডাক্তারী কেন?' কামাখ্যা ডাক্তার নিজের পেশাদারী গাম্ভীর্য এতক্ষণে আবার ফিরে পেয়েছে, তাছাড়া হেতুড়ে ডাক্তার হ'লে কি হয়, লোকটা নেহাৎ খারাপ নয়। সে এবার রেগে না উঠে ভারিক্কি সুরে বললে, 'যাও হে রুইদাস যাও, সকালবেলায় ঝামেলা কোর না। ওষুধ পছন্দ না হয় নিও না. ব্যাস ফুরিয়ে গেল। তোমায় তো আর আমি জুলুম করে ওষুধ দিচ্ছি না।'

'গছিয়ে দিলেই আমি যেন নিচ্ছি।' অত্যন্ত দুর্বলভাবে নিজের তেজটা বজায় রাখবার করুণ চেষ্টা করে রুইদাস ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে গেল। ইচ্ছে থাকলেও আর বেশীক্ষণ তার আর সময় নেই। প্রায় ছুটতে ছুটতে গুমটি ঘরের দিকে সে নেহাৎ দম দেওয়া পুতুলের মতই এগোচ্ছে। কিন্তু মনটা তার কেমন যেন তছনছ হয়ে গেছে। কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল! কেনই বা সে এমন হয়ে যায়! আজ যে ডাক্তারের কাছে একেবারে কেঁদে পড়বে ঠিক করে এসেছিলো। ভেবেছিলো ডাক্তারের হাত দুটো ধরে বলবে, 'ছেলেটাকেও রাখতে পারলে না ডাক্তার, ছেলের মাকেও কি পারবে না।'

একটা তেজী কিছু ওষুধ দাও ডাক্তার, যাতে একবার চোখ মেলে জেগে ওঠে! ওযে চোখ মেলে চাইতেও ভুলে গেছে।' কিন্তু কি যে তার বদ্‌স্বভাব, পেটের কথাগুলো গলা পর্যন্ত এসে কেমন ঝাঁঝালো তেতো হয়ে ওঠে। ফস্ করে কি যে বলে ফেলে কখন। সব কিছু ভেস্তে যায়।

অথচ কামাখ্যা ডাক্তার ছাড়া গতিও তার নেই সে জানে। ইস্টিশানের কাছে বাজারের মাঝখানে পেতলের সাইনবোর্ড মারা ঘোষাল ডাক্তারের ডাক্তার-

খানায় তার মত লোকের পাত্তা নেই। আর কামাখ্যা ডাক্তার মানুষও সত্যি ভালো। কলকাতার কোনো ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডারী ছেড়ে দিয়ে দেশে গাঁয়ে এসে নিজেই ডাক্তার বনে বসেছে বটে, কিন্তু অনেক পাশ করা ডাক্তার তার কাছে হার মানে, গরীবের ঘরেই তার পসার। গরীবের সুখ-দুঃখ অভাব অনটন সে বোঝে। ভিজিট পেলে নেয়, না পেলে ক্ষেতের লাউ-কুমড়ো-বেগুন দিয়ে এলেও ব্যাজার হয় না। ছেলেটার অসুখের সময় কামাখ্যা ডাক্তার কি না করেছে। ভিজিটের নাম-গন্ধ নেই দুবেলা নিজের গরজে এসে দেখেছে, শেষ কটা দিন রাত পর্যন্ত জেগেছে যমের সঙ্গে যোঝবার জন্যে। কেন যে অমন কড়া কথা বলে ফেল্‌লে, বলে ফেলে আর কথা কি করে ফেরাতে হয় সে জানে না।

'ওই রুইদাস এসে পড়েছে গো, দিবে এখুনি গেট বন্ধ করে হেট হেট।'

রুইদাস লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে এসে পড়েছে। একসার কাঠ বোঝাই গরুর গাড়ী চল্‌েছে স্টেশনের দিকে। রুইদাসকে দেখে ক্রসিং পার হবার জন্যে তাদের তাড়াহুড়ো পড়ে যায়। বড় কড়া ত্যাঁদোড় লোক রুইদাস তারা জানে।

রুইদাস কিন্তু গেটের দিকে যায় না। সোজা সে তার গুমটি ঘরে গিয়ে ঢোকে। রেল লাইনের পাশে লাল টালিতে ছাওয়া ছোট্টো একটি ঘর। একটা মানুষ হাত-পা গুটিয়ে কোনোরকমে শুতে পারে। এরই ভিতর রুইদাসের গোটা সংসার কুলোতে হয়। সংসার বলতে অবশ্য এখন তার রুগ্না স্ত্রী রাখালী, সে ও একটা ছাগলী। ঘরের পেছন দিকে একটা টিন হেলান দিয়ে একটা ছাউনি মত করেছে। সেইখানেই রান্না হয়। ছাগলীটাও সেইখানেই বাঁধা থাকে। ছেলেটার অসুখের সময় ধারধোর করে ছাগলীটা কিনেছিলো তাকে দুধ খাওয়াবার জন্য। ছাগলীটা বাচ্চা দেবার আগেই ছেলেটা শেষ হয়ে গেল। ছাগলীটা তবু আছে। বাচ্চা হতে আর দেরী নেই।

সকালে যেমন দেখে গেছল রাখালী এখনও তেমনি জ্বরে বেহুঁশ হয়ে আছে! শুধু ঘরটা জলে থই থই করছে। ঘরের মধ্যে কলসী থেকে একবার বোধ হয় জল গড়িয়ে খেতে গেছল। বেকায়দায় কলসীটা উল্টে গেছে। রাখালীর শোবার কাঁথা মাথার চুল ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে। কিন্তু তার সাড়া নেই। জলটা ঝেঁটিয়ে এখুনি বার করে দিলে ভালো হয়।

কিন্তু সময় নেই। রুইদাস রাখালীকে টেনে বিছানার অন্য দিকে একটু সরিয়ে দ্যায়। রাখালী অস্ফুট কি রকম একটা শব্দ করে মাত্র। একবার আচ্ছন্ন চোখের পাতাগুলো টেনে বুঝি খোলবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। কলসীটা গড়িয়ে গেলেও ভাঙ্গেনি। যে টুকু জল তাতে ছিল তাই বাটিতে ঢেলে রাখালীর মুখটা হাঁ করে একটু ঢেলে দিয়ে রুইদাস বাইরে আসে। মালগাড়ী পাশ করবার আর দেরী নেই। লাঠা দেওয়া গেটটা নামাতে নামাতে রুইদাস পেছনে দূরের রাস্তায় মোটরের হর্ণ শুনতে পায়। চাবি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোটরটা সশব্দে পেছনে থেমে যেন রুদ্ধ আক্রোশে গর্জন করতে থাকে। 'এই—এই রুইদাস!'

রুইদাস চাবিটা নীল কোর্তার পকেটে রেখে ধীরে সুস্থে পেছন ফিরে তাকায়, মোটর নয় মোটরলরী আসছে ফুলডুংরি থেকে খোয়া-পাথর বোঝাই করে। ড্রাইভার সাধন সিকদার নিজেই নেমে আসে গাড়ী থেকে। প্রথমটা কড়া মেজাজে বলে, 'গেট নামালে যে বড়; হর্ণ দিচ্ছি শুনতে পাও না।'

'শুনব নি কেন, কালা ত নই।'

'খুলে দাও গেট, এখনও গাড়ীর অনেক দেরী।'

ভ্রূক্ষেপ না করে রুইদাস ঘরের দিকে এগোয়।

রুইদাসকে চিনতে সাধন সিকদারেরও বাকী নেই। এবার তার সুর নরম হয়ে আসে। 'বলি চলেই যাচ্ছো যে, শোন না।'

রুইদাস জবাব দেয় না।

সিকদার এগিয়ে গিয়ে হাতটা ধরে ফেলে তার। অনুনয় করে বলে, 'একটি দিন ছেড়ে দে রুইদাস। সকাল আটটার মধ্যে একটা ক্ষেপ পেঁছে দেবার কথা। ন'টা প্রায় বাজে। কন্ট্রাক্টরের নতুন সরকার বেটা এসে অবধি আমার পেছনে লেগেছে। আজ বাগে পেয়ে চাকরীটা খতম করে ছাড়বে।'

রুইদাসের মনটা বুঝি একটু নরম হয়। কিন্তু খিঁচিয়ে উঠে সে বলে, 'অত যদি গরজ ত আরও ভোর ভোর উঠতে পার নি, নেশাভাঙ করে পড়েছিলে বুঝি!'

এবার রেগে উঠে রুইদাসের হাতটা ছেড়ে দিয়ে সিকদার বলে, 'নেশা-ভাঙ করে পড়ে থাকি আমি, বড় বেশী তোর তেজ হয়েছে রুইদাস। যা মুখে

আসে তাই বলিস। ভারি এক রেল গেটের জমাদার হয়ে ধরাকে একেবারে সরা জ্ঞান করিস। কিন্তু তেজ ভাঙবে, আর দেরী নেই; তোর মত কুকুরেরও মুগুরও আছে জানিস।'

রুইদাস উত্তর না দিয়ে নিজের ঘরে ঢোকে। সিকদারের অভিশাপগুলো শুনেও সত্যি তার রাগ হয় না। নিজের দোষ সে জানে। জানে যে কেউ তাকে দেখতে পারে না; বন্ধু বলতে কেউ তার নেই। তার মুখের দোষে নয়, বেয়াড়া ঘাড়ের জন্যেও বটে। ঘাড় হেঁট করতে পারে না বলেই জীবন ভোর মাথাটা তার ঠুকতেই গেল। নোয়ানো মাথার মাপে দুনিয়ার সব দরজা যখন কাটা তখন মাথা সোজা করে কোন্‌খানে তার জায়গা মিলবে, সব দরজাতে তার তাই শুধু মাথাই ঠুকেছে, পার হওয়া আর হয় নি।

চাষার ঘরের ছেলে, কিন্তু চাষবাস তার ধাতে সয় নি। ধান কাটতে যাকে নুইতে হয় তার মাথা যে আর কোথাও তোলবার নয় সেটা বোধগম্য হয় নি। জমিদারের পাইকের সঙ্গে মারপিট প্যাঁচাল এক দাঙ্গার মামলায় পড়ে তাই তাকে দেশত্যাগী হতে হয়েছে। ঘটে বুদ্ধিশুদ্ধির অভাব নেই, খাটবার গতরও আছে জোয়ান শরীরে, তাই কাজের অভাব হয় নি।

রেল লাইনে ভালো কাজই সে পেয়েছে, কিন্তু বুঝে শুঝে চলতে পারে নি কোথাও, ওপরওয়ালাদের নেকনজর পড়ে নি কোনমতেই। সমান-সমানদের সঙ্গেও বনিবনা হয় নি।

পয়েণ্টস্‌ম্যান থেকে নেমে তাই লেভেলক্রসিংয়ে এসে কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে শুধু নেহাৎ কাজের গুণে। কাজে ফাঁকি নেই, নিয়মকানুন একচুল নড়চড় হ'তে সে দেয় না। তাছাড়া ওপর নীচে কারুর সঙ্গে ঠোকাঠুকি বাধবার অবকাশই এই নির্বাসনের রাজ্যে নেই।

তবু নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে শিখল কই। মেজাজ তার কিছুতেই শোধরাবার নয়, মুখও রাশ মানে না। জ্বরে এমন করে বেহুঁশ হয়ে যাবার আগে রাখালী এক একদিন বলেছে, 'আমি মরলে তোমায় একাই কাঁধে করে পোড়াতে নিয়ে যেতে হবে। কেউ তোমার বাড়ীর ছায়া মাড়াবে নি।'

রুইদাস দাঁত খিঁচিয়ে বলেছে বটে, 'তোকে পোড়াতে আমি একাই পারবো সে ক্ষ্যামতা আমার আছে।' কিন্তু মনে মনে সত্যি তার নিজের ওপর ধিক্কার এসেছে। কেন সে আর সবাইকার মত নয়। কেন সে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে পারে না।

আজও বাইরের টিনের ছাউনিটার তলায় ইঞ্জিনের পোড়া কয়লা দিয়ে উনুনটা ধরাতে ধরাতে নতুন করে সে সংকল্প করে ভাল মানুষ হবার। না, ঘাড় আর সে তুলবে না! ঘাড় সোজা করে এতদিন শুধু ধাক্কাই যদি খেয়ে থাকে, এবার ঘাড় নীচু করেই দেখবে লাভ কিছু হয় কিনা, রাখালীকে 'কুইলাইন' নইলে বাঁচানো যাবে না সে জানে! কুইনিন তার মত হেজিপেঁজির জন্যে নয়। হোমরা-চোমরাদের হাতে পায়ে ধরলে হয়তো একটু পাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারে অনুগ্রহ করে। তাই সে ধরবে। কোথাও না হয় খোদ হাকিমের কাছে গিয়ে ধর্ণা দিয়ে পড়বে। জংশন ষ্টেশনে ট্রেন ধরবার সুবিধের জন্যে হাকিমের গাড়ী প্রায়ই এই রাস্তা পার হয়ে যায়। সেই সময়েই একবার পা জড়িয়ে ধরবে।

কি একটা গোলমাল যেন তার ঘরের দিকেই এগুচ্ছে শুনে রুইদাস পিছু ফিরে তাকায়। মালগাড়ী এখনও পাশ হয়ে যায় নি। এত গোল তাহলে কিসের?

দরজার কাছে ক'টা ছায়া পড়ে।

'কোথায় হে রুইদাস', কড়া গলায় জবরদস্ত হাঁকের পর আরো দু'চার জনের সঙ্গে খোদ হাকিম সাহেবের উর্দিপরা চাপরাশি এসে দরজায় দাঁড়ায়।

রুইদাস ব্যাপারটা প্রথমে ঠিক বুঝতে পারে না, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

চাপরাশি গম্ভীর গলায় জানায়, 'হাকিম সাহেব তলব করেছেন—চলো।'

হাকিম সাহেব তলব করেছেন।' রুইদাস নিজের কান দুটোকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। মনে কথাটা উঠতে না উঠতে এত সহজে এত তাড়াতাড়ি ফলে যাবে যে সে ভাবতেই পারে নি।

'কোথায় হাকিম সাব?' ব্যস্ত হয়ে সে উঠে দাঁড়ায়।

'দোর গোড়ায় হেঁটে এসেছেন, তিনি মোটরে আছেন—চলো।'

চাপরাশির মুখ ধাকানিটাও রুইদাস গায়ে মাখে না, একবার রাখালীর দিকে তাকায়। মুখটা তার ঘেমে উঠেছে! এইবার জ্বর ছাড়বার পালা। একটু ওষুধ যদি সময় মত পড়ে তাহলেই বোধহয় সব ঠিক হয়ে যাবে। কলম নিশ্চয়ই সাহেবের কাছেই আছে। একটুকরো কাগজ সে যোগাড় করে নেয়।

চাপরাশি ধমক দিয়ে উঠে। 'বলি কি হচ্ছে কি! হাকিম সাহেব কি তোমার জন্যে বসে থাকবেন নাকি।'

'না এই যে যাই।' রুইদাস সবার আগে বেরিয়ে পড়ে। চারিধারে যে গুঞ্জন ওঠে তার আসল মানেটা তার মাথায় তখনও ঢোকে নি।

রেল গেটের এ পাশে গোটা দুই লরী, খানকয়েক গরুর গাড়ী এর মধ্যে জমা হয়ে গেছে, তার ভেতর হাকিম সাহেবের মোটরকে সসম্ভ্রমে সামনের দিকে জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

রুইদাস সেই মোটরের দিকেই এগোয়। পেছন থেকে চাপরাশি ধমক দিয়ে বলে, 'ওদিক পানে যাচ্ছ কোথায় হে, আগে গেটের চাবি খুলে দাও।'

রুইদাস সে কথায় কান দেয় না। সটান হাকিম সাহেবের মোটরের কাছে গিয়ে হাজির হয়। তারপর সত্যি সত্যি মাথাটা নুইয়ে সেলাম করে বলে, 'হুজুর যদি একটু দয়া করেন।'

হাকিম সাহেব একটু অবাক হন। একটু অপ্রসন্নও। রাস্তায় ঘাটে বেকায়দায় পেয়ে তাঁকে দিয়ে এ রকম দয়া করিয়ে নেওয়াটা মোটেই তাঁর পছন্দ নয়। তাছাড়া চাপরাশি বেয়ারার বেড়া কি জন্যে আছে, যদি তাঁর ওপর যে সে এসে এমন করে চড়াও হতে পারে! তবুও চড়াও যখন হয়েছেই তখন বিরক্ত হ'লেও পোষাকী একটু হাসি টেনে তিনি বলেন, 'এখন তুমি গেটটা খোল দেখি'—কথা নিজেই তাঁকে বলতে হয় বলে বেশী খারাপ লাগে।

রুইদাস তবু নড়ে না, কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'দয়া করে একটা সই করে দেন হুজুর। কুইলাইন অভাবে বৌটা মরতে বসেছে। আপনি একটু কলম ছোঁয়ালেই আর ভাবনা থাকে নি।'

হাকিম সাহেব সত্যি বদমেজাজের লোক নন, বরং এই এক বছরে এই মহকুমার উদার অমায়িক বলে বেশ একটু সুনামই তিনি অর্জন করেছেন। এতটা বাড়াবাড়ি তাবলে কি করে বরদাস্ত করা যায়। মুখে তাঁর একটু ভ্রূকুটি দেখা দেয়।'

চাপরাশি এই ভ্রূকুটি টুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। রুইদাসের কাঁধটায় এক ধাক্কা দিয়ে বলে, 'কি ঝামেলা লাগিয়েছ এখানে, যাও গেট খুলে দাও।'

রুইদাসের ঘাড়টা একটু যেন টান হয়ে ওঠে। চাপরাশির ধাক্কাটা

গ্রাহ্য না করে সে আবার বলল, 'দোহাই হুজুর, গরীবের ওপর একটু দয়া করুন।'

চাপরাশি বুঝি এবার ঘাড় ধাক্কাই দিতে যাচ্ছিল। হাকিম সাহেব হাত নেড়ে তাকে নিষেধ করে আবার সেই পোষাকী হাসি টেনে বলেন, 'আমি কি দয়া করবো বল, কুইনিন দরকার হয় ডাক্তারকে দিয়ে সই করিয়ে নাওগে যাও।'

'ভিজিটের অত টাকা কোথায় পাব হুজুর। ভিজিট না দিলে ডাক্তার ত সই করবে নি।'

'তাহলে আমি কি করতে পারি বল, কুইনিন তো আমার দয়ার ব্যাপার নয়, আইনের ব্যাপার।' হাকিম সাহেব এবার বিরক্তিটুকু গোপন করেন না।

'আইনের ত আপনারাই মালিক হুজুর।'

হাকিম সাহেবের এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তবু নিজেকে সামলে গম্ভীর ভাবে বলেন, 'মালিককেও আইন মানতে হয় বুঝেছো। যাও এখন গেটটা খুলে দাও গিয়ে।'

'গেট ত খুলতে পারব না হুজুর'—রুইদাস এবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

হাকিম সাহেব প্রথম কথাটা শুনেছেন বলে বিশ্বাসই করতে পারেন না। আশেপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের মত খানিক স্তম্ভিত হয়ে থেকে তিনি অবশেষে বলেন, 'পারবে না মানে?'—নিজেকে সামলাতে মুখ চোখ তাঁর তখন লাল হয়ে উঠেছে।

'খোলবার আইন নাই হুজুর।'

'আইন থাকে না থাকে আমি বুঝবো। আমি বলছি তুমি গেট খুলে দাও।'

—যথাসাধ্য সরকারী গাম্ভীর্য বজায় রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও মনে হয় গলাটায় একটু যেন চিড় ধরেছে।

'মাপ করবেন হুজুর, পারব না। আইন মালিককেও মানতি হয়।'

শুধু হাকিম সাহেবের মুখের ওই চেহারাটুকু দেখার দরকার ছিল। এত বড় আস্পর্ধা! ছোট মুখে এত বড় কথা!' চাপরাশির চড়টা সজোরে গালে এসে লাগে, আরদালির রদ্দাটাও সেই সঙ্গে ঘাড়ে! দুজনে নেকড়ে বাঘের মত রুইদাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। রুইদাসের হাতের একটা

ঘা খেয়ে চাপরাশি মাটি নেয় বটে কিন্তু নিজেও তখন ছিটকে পড়েছে। কানের ঘুসিটায় মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলেও হুঁস তার যায় নি। যতগুলো মানুষ তার চারধারে ভীড় করে এসেছে সবাই তার বিপক্ষে সে জানে। কেউ তাকে পছন্দ করে না, তার হয়ে দাঁড়াবার কেউ নেই, এতগুলো লোকের কাছে জারিজুরি বেশীক্ষণ খাটবে না সে বোঝে। কিন্তু তবু হার সে মানবে না কিছুতেই! এখনও গেটের চাবি তার কাছে। সে চাবি দেবে না, প্রাণ থাকতে। যে করে হোক এ চাবি তাকে এদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। চাপরাশি মাটি থেকে উঠে আবার তার দিকে তেড়ে আসছে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ভিড়ের একটা ফাঁক দিয়ে সে ছুটে বেরিয়ে যায়। জমাট মানুষের ভীড় কি করে তার সামনে ধোঁয়ার মত ফাঁক হয়ে যায় সে বুঝতে পারে না।

পেছনে একটা মস্ত সোরগোল উঠেছে সে টের পায়। কিন্তু একবার ভিড় থেকে বেরিয়ে পিছু ফিরে আর সে তাকায় না। লাইনের ওধারে রেলের তারের বেড়া। তারের বেড়া টপকে গেলে ক'টা কাঁটা ঝোপে ঢাকা পাথুরে ঢিবি। সেই ঢিবিগুলোর ওধারে দুর্ভেদ্য ঘন জঙ্গল দূরের পাহাড় ছড়ানো! সোজা সেই জঙ্গলের দিকে রুইদাস রওনা হয়। একেবারে ঘন গাছের ঝোপে গিয়ে না পৌঁছোন পর্যন্ত তার পিছু নিতে কেউ পারে নি।

সারাদিন বনের মধ্যে লুকিয়ে কাটিয়ে গভীর রাত্রে রুইদাস চুপিচুপি চোরের মত তার ঘরের দিকে ফেরে। সারাদিনের অনাহারে দুর্ভাবনায় শরীরটার চেয়ে মনটাই তার যেন ভেঙে পড়েছে, নিজের আহাম্মুকির জন্যে আপশোষের তার আর সীমা নেই তখন। রাখালীর এতক্ষণে কি হাল হয়েছে কে জানে, বেঁচে যদি বা থাকে প্রাণটা ঠোঁটে এসে ঠেকেছে সন্দেহ নেই। কেউ একবার উঁকি মেরে দেখে তার মুখে একটু জল দেবে এতটুকু আশাও সে করতে পারে না। সবই তার দোষ। না, এইবার সে সত্যি করে নিজেকে শোধরাবে পণ করেছে! রাখালীকে একবার দেখে সে হাকিম সাহেবের কাছে গিয়ে ধরা দেবে। মাটিতে মাথা লুটিয়ে মাপ চাইবে। যা শাস্তি নেবার নেবে। ঘাড় আর সে জীবনে সোজা করবে না।

সন্তর্পণে উঠোনের দিকে বেড়াটা টপকে পিছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়ায়। ঘরের ভিতর একটা লণ্ঠন জ্বলছে। তারই আলোয় জন তিনচার লোককে সেখানে দেখা যাচ্ছে। রুইদাসের পায়ের

শব্দে ফিরে তাকিয়ে, 'কে'? বলে একজন উঠোনে বেরিয়ে আসে। রুইদাস অবাক হয়েই বোধহয় আর পালাবার চেষ্টা করতে ভুলে যায়। লোকটা আর কেউ নয়—সাধন সিকদার।

সিকদার তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বলে, 'তা বলে এই রাত করে! আমরা তো ভাবছিলাম, বুঝি আজ আর আসবিই না।'

অন্যেরাও এখন তাদের কথা শুনে উঠোনে নেমে এসেছে। রুইদাস বিমূঢ়ভাবে তাদের দিকে তাকায়! সাধন সিকদার, নরহরি মালি, এমন কি কামাখ্যা ডাক্তার পর্যন্ত এত রাত অবধি তার ঘরে বসে আছে তারই অপেক্ষায়।

ধরা গলায় সে জিজ্ঞাসা করে কোন রকমে, 'কেমন আছে এখন?'

'তোর বৌ! ভালো আছে, ভালো আছে।' সিকদার জবাব দেয়, 'কামাখ্যা ডাক্তার নিজে হাতে ওষুধ এনেছে, চারটিখানি কথা ত নয়।'

'মিথ্যে মিথ্যে সকালবেলা আমায় যা নয় তাই বলে মেজাজটা বিগড়ে দিয়ে এলি!' কামাখ্যা ডাক্তার হাসতে হাসতে বলে, 'থাকলে আর ভালো ওষুধ দিই না।'

নরহরি তাড়া দিয়ে বলে, 'সময় বড় অল্প হে, ভোর না হতেই হয়ত থানার লোক এসে হানা দেবে। যা সলাপরামর্শ এই বেলা সেরে ফেল।'

তারা সবাই ঘরে গিয়ে ওঠে। রাখালী ঘুমিয়ে আছে! তার পাশে একটি কে মেয়ে ঘোমটা টেনে বসে আছে! অবাক হয়ে রুইদাসকে সেই দিকে চাইতে দেখে সিকদার যেন একটু লজ্জা পেয়ে বলে, 'নিয়ে এলাম বৌটাকে! দেখাশোনা করতে একটা মেয়েছেলে চাই!'

এবার তাদের পরামর্শ সুরু হয়। রুইদাস হতভম্বের মত শুনে যায় শুধু। শহরে বাজারে নাকি হৈ হৈ পড়ে গেছে। তার নামে নাকি হুলিয়া বেরোবে। জবর খুন জখম দাঙ্গার দায়ে তাকে জড়ান হয়েছে। আরদালির দুটো দাঁত ভেঙেছে, চাপরাশির গা থেকে হয়েছে রক্তপাত। রেলের চাকরীর দফাও তার রফা, ওপরওয়ালাদের কাছে খবর গেছে।

তা যাক কুছ পরোয়া নেই। সিকদারও এখানে বেশীদিন আর থাকছে না। রুইদাস চায় ত মামলা লড়ুক, আর নয় ত সিকদার এখুনি বেরিয়ে পড়তে রাজি তাকে নিয়ে। কেউ তাদের চুলের টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাবে না। রুইদাসের বৌয়ের জন্যেই বা ভাবনা কিসের?

সিকদারের যা হোক একটা চুলো ত আছে। সেখানে তার বৌ-ছেলে মেয়ের জন্যে যদি দুমুঠো জোটে তাহলে রুইদাসের বৌকেও উপোসী থাকতে হবে না! আর তারা দুটো জোয়ান মদ্দ—এত বড় দুনিয়ায় তাদের দানাপানি কি কোথাও মিলবে না?

রুইদাস অবাক হয়ে এদের মুখের দিকে চায়। শুধু লণ্ঠনের মিটমিটে আলোয় এদের মুখ এত জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠেনি। কি একটা নতুন কিছু যেন তারা পেয়েছে। রুইদাসকে তারা বিষনজরে দেখে না! তার বেয়াড়া ঘাড় তার ঝাঁঝালো তেতো মুখ তারা যেন নতুন একদিক থেকে দেখেছে! হয়ত কাল সকাল পর্যন্ত এ উৎসাহ তাদের সবার থাকবে না, তবু হঠাৎ তারা যেন এইটুকু আবিষ্কার করে অবাক হয়ে গেছে যে, মাথাটা উঁচু করে রাখবার জন্যেই ঘাড়ের ওপর বসান, মাটিতে লুটোবার জন্যে নয়।

———

সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সহযাত্রী

ট্রামে বেশী ভিড় ছিল না। তাও আমাকে কয়েকটা স্টপেজ দাঁড়িয়ে থাকতে হল। কিছুক্ষণ পরে দুটো লেডিজ সিট খালি হতেই আমি তাড়াতাড়ি দুটোই সিট জুড়ে আরাম করে বসলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ ছড়িয়ে বসার সুখ সইলো না। পরের স্টপেই এক মহিলা এসে আমার পাশে বসলো। কিছুটা বিরক্ত হয়ে নিজেকে একটু গুটিয়ে নিয়ে বসলাম। জানলা দিয়ে বাইরে দেখছিলাম কিন্তু মহিলার বেশবাস থেকে সেন্টের একটা অপূর্ব সুগন্ধ ভেসে আসতেই আমি তার দিকে তাকালাম। দেখি—শুধু আমি কেন, সামনের রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকেরাও তাকেই দেখছে—কখনো আড়চোখে কখনো বা সোজাসুজি একদৃষ্টে। কিছুক্ষণ আগে অবধি এই সব যাত্রীরা আমাকেই দেখছিল, সেজন্য আমি জানলার বাইরে তাকিয়েছিলাম।

ট্রামে আরো মহিলা যাত্রী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা প্রায় সকলেই বৃদ্ধা, বোধহয় কোন মন্দিরে পুজো দিয়ে কিংবা গঙ্গাস্নান সেরে ফিরছিলেন। লোকেরা যে তাঁদের দেখবে না সেটাই স্বাভাবিক।

পাশের মহিলার এবার খেয়াল হল যে সকলে তাকেই দেখছে। তাই সে নিজেকে নিয়ে বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কখনো শাড়ি সামলাচ্ছে, কখনো হ্যান্ডব্যাগ আবার কখনো মুখের ওপর এসে পড়া অবাধ্য চুলগুলিকে ঠিক করছে।

আমি ইচ্ছে করেই চোখ সরিয়ে নিলাম, তার দিকে তাকালাম না, কিন্তু লোকেরা তাকে বারে বারে দেখছিল বলে আমার চোখ ঘুরে ফিরে তার উপরেই পড়ছিল। কেনই বা লোকগুলো তার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকবে? কিই বা এমন দেখতে? তার দিকে যাতে চোখ না যায় সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু তবুও হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে গেল।

পরক্ষণেই সে দৃষ্টি সরিয়ে ট্রামের মধ্যে দিদিমা বা ঠাকুমার কোল ঘেঁসে বসা দুটি বাচ্চা ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলো।

তার এরকম ভাবে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হলো আমি দেখতে কুৎসিত, শ্রীহীন, একেবার আনস্মার্ট। আমি হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। অকারণেই আমি নিজের বেশভূষার প্রতি অতিরিক্ত সচেতন হয়ে উঠলাম। মনে হল শাড়িটা আজ ভাল পরা হয়নি, কুঁচিটা ওলোট-পালোট হয়ে গেছে, খোঁপাটাও যেন ঠিকমত বাঁধা হয়নি।

পরের স্টপেজে ট্রামে একগাদা লোক উঠলো। আমার স্বামী দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু ভিড়ের চাপে তিনি চোখের আড়াল হয়ে গেলেন। হঠাৎ আমার মনে হল, তাহলে কি উনিও এতক্ষণ এই মহিলাকে দেখছিলেন। না দেখার কোন কারণ নেই কারণ আমি তার পাশেই বসে। আমাকে দেখার ছলে হয়তো……

শাড়ি ঠিক করতে করতে আমি লক্ষ্য করলাম যে, আমার শাড়িটা তার চেয়েও সুন্দর ও আরো দামী। নিজের রুচির জন্য আমি বেশ গর্বিত বোধ করলাম। হঠাৎ পাশের যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে আমার আনন্দটা নিভে গেল। আশ্চর্য, এখনও সকলে ওকেই দেখছে—নানা অছিলায়! আমার মনটা চুপসে গেল। জানিনা কেন, আমিও তাকে দেখতে লাগলাম। মহিলা চঞ্চল হয়ে আবার চুল ঠিক করতে লাগলো, হাতব্যাগটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। আমার মনে হল মহিলা যেন অতিরিক্ত তৎপরতা দেখাচ্ছে।

লক্ষ্য করলাম দূরে আর এক ভদ্রলোক মহিলাটির শ্যাম্পু করা কাঁধ-ছোঁয়া চুলগুলো একদৃষ্টে দেখছেন। আমার হাতটাও নিজের চুলে পেঁছে গেল—মনে হল আমার চুলের ফাঁক থেকে বোধহয় পাকা চুলগুলো উঁকি-ঝুঁকি মারছে। আমার হাতের নীল শিরাগুলো যেন উঁচু হয়ে ফুলে রয়েছে, কোমরটাও বিশ্রীভাবে মোটা হয়ে গেছে—আমি অত্যন্ত কদাকার হয়ে গেছি।

হঠাৎ চমকে উঠি—মহিলার পাশের বৃদ্ধাটি তাকে সময় জিজ্ঞেস করছেন। মহিলা নিজের ঘড়ি দেখে বললো, "আটটা বেজে কুড়ি"—গলার স্বরটা যেন মধুমাখা। আমার মনে হল আমার গলার স্বর কর্কশ হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমি কেন আজ ঘড়িটা পরিনি?

অস্বস্তি বেড়েই চলছিল, আমার স্টপেজ আসতে আর কত দেরী? ট্রামটা যেন নড়তেই চাইছে না। বাড়ি পেঁছিবার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠি।

নামবার সময় স্বামীর মুখের দিকে তাকালাম। তাঁর মুখে একটা নির্লিপ্তভাব। সারাটা পথ চুপ করে রইলাম। বাড়ি ফিরে কাপড় না বদলেই সোফার ওপর বসে পড়লাম। কিছু যেন ভাল লাগছিল না। সামনের ছোট টেবিল থেকে উল-কাঁটা তুলে নিয়ে উদাস মনে কাঁটায় ঘর তুলতে লাগলাম।

স্বামী ঘরে ঢুকতেই আমি ঘর তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করি—

"শোন, তুমি ট্রামে সেই মহিলাকে দেখেছিলে?"

"কোন্ মহিলা?"

"ঐ তো, আমার পাশে যে বসেছিল।"

"না কেন?"

"সকলেই তো দেখছিল, আর তুমি দেখনি?"

"বলছি তো দেখিনি। কেন, কি ব্যাপার?"

"এমনি জিজ্ঞেস করছি।"

"হঠাৎ জিজ্ঞেস করছো যে?"

"সকলে দেখছিল, তাই জিজ্ঞেস করলাম।"

"নাঃ, আমি দেখিনি।"

কথাটা শুনে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমি নিজের কাঁটা থেকে দশটা ঘর ফেলে দিই, বেশি তোলা হয়ে গিয়েছিল।

———

জীবন সরকার

হাট

দূর থেকেই বটগাছটা দেখা যায়। বেশ ঝাঁকড়া। কতদিনের কেউ তা জানে না। কাউকে জিগ্যেস করলে বলে কি জানি আমরা তো ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি। বেশ দেখতে গাছটা।

পৌষ সংক্রান্তিতে আবার এই গাছটারই নিচে মেলা বসে, অনেক গ্রাম থেকে লোকজন আসে। গাছের একটা গুঁড়িতে তেল দিয়ে সিঁদুর মাখান আছে। গাছটা নাকি জাগ্রত দেবতা। মানত করে অনেকেই। কি হয় তা কেউ বলতে পারে না। তবে সকলেই মান্য করে। এই গাছটার নিচে প্রতি শনিবার আর মঙ্গলবার বিরাট হাট বসে। কারা কোথায় বসবে তাও ভাগ করাই আছে। হাটবাবুই ভাগ করে দেয়। কাপড়ের দোকান একদিকে, মণিহারী অন্যদিকে। হালুইকর-এর দোকানে জিলিপী গরম গরম ভাজা হচ্ছে। তার একটা গন্ধ আসে বেশ মিষ্টি। বেশ ভাল লাগে। সুগন্ধ ছড়িয়ে যায় বাতাসে। বেলা বাড়ার সংগে সংগে হাটে লোক আসতে আরম্ভ করে। দুপুরে একেবারে জমজমাট।

বেলা বাড়ার সংগে সংগে লোক কমে যায়। মাঝখানের সময়টা ভীষণ গমগমে। কেনাবেচা রীতিমত চড়া সুরেই হয়।

দীপায়ন হাটে এসে একমনে বটগাছের নীচে বসে অনেক কিছু ভাবছিল। এত লোক কোথা থেকে আসে। এত লোক আবার যায়ই বা কোথায়! অন্যান্য দিন একদম ফাঁকা। বেলা থাকলে দুই একজন যদিও বা আসে সন্ধ্যাবেলায় একদম নিঃঝুম। তারপর এক সময় ছেঁড়া পাতা আর কাগজ উড়ে যায়। দীপায়নের মনে হয় হাওয়ায় যেন একটা বিষণ্ণ সুর। কে যেন কাঁদে। দূর থেকে সেই কান্নাই ভেসে আসে। দীপায়ন সেই কান্না যেন শুনতে পায়। তখন আরো গভীরভাবে সেই কান্না শুনবার জন্য বটগাছের ডালে

কান রাখে। কোথা দিয়ে আসে সেই কান্না! দীপায়ন সকালবেলায় হাটে এসে দেখেছে। শিশুর মত হাঁট ফাঁকা। কেমন যেন মিষ্টি স্নিগ্ধতা।

দুপুরে আরেক রকম। খাঁ খাঁ করে চারপাশ। বুকের ভিতরে তৃষ্ণা। কি যেন খোঁজে দীপায়ন।

সন্ধ্যেবেলায় আবার এক রকম। দর্জির দোকানে টিমটিম আলো জ্বলছে। কেরোসিনের বাতি। কোন ঘরে বা হ্যাজাক। এখনো ইলেকট্রিকের আলো আসে নি। পি. ডবলিউ ডি রাস্তায় এসে গেছে। কয়েক মাসের মধ্যেই লাইট এসে যাবে বোধহয়।

আর এখন রাত্রিবেলায় ভয় লাগে। কোন গাছে ভুতুম পাখী ডাকে। কিংবা দূরের ক্ষেতে শেয়াল। দীপায়ন রাত্রেও এসে দেখেছে। আবার ভোরবেলা চলে গেছে। রাতে বটগাছটা আরো বিরাট দেখায়।

দীপায়ন এই হাটকে ভালবাসে। ছুতোয় নাতায় বারেবারেই ও হাটের দিকে যায়। মন খারাপ লাগলেই হাটে এক চক্কর মেরে আসে। কি করবে। কোথাও যেন শান্তি নেই ওর। কোথাও সুখ নেই। সুখ-শান্তি দীপায়নের জীবন থেকে অনেকদিন দূরে সরে গেছে।

খাওয়া-পরার অভাব নেই দীপায়নের। ঘরে মা-বাবা দাদা-বৌদি সবাই আছে। শুধু নেই সুখ, নেই শান্তি।

সুখ নামে সেই যে পাখী কোন বনে থাকে কে জানে? সেই বন দীপায়ন অনেক খুঁজেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত পায় নি কোথাও।

অনেক জায়গায় বেড়াতে গেছে দীপায়ন। দেশ দেখেছে অনেক। অনেক লোকও দেখেছে। কিন্তু সেই বস্তুটার দেখা পায়নি। অবশেষে এই হাট। হাটই ওর জীবনে এখন ধ্যানজ্ঞান। এই হাটছাড়া আর কিছু জানে না ও। দুপুর বেলায় যখন লোকের জন্য হাটের ভেতর দিয়ে হাঁটা যায় না, কেনাবেচার একটা গমগম শব্দ বেশ ভাল লাগে দূর থেকে শুনতে। একসংগে হাজার হাজার কথা শোনা যাচ্ছে। আসলে কোন কথাই শোনা যাচ্ছে না। হাজার হাজার কথার শব্দ একসংগে একটা শব্দ হয়ে হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে।

দীপায়ন সেই শব্দের সংগে অনেক দূরে চলে যেতে চায়। কিন্তু সেই যাওয়ার রাস্তাটা বের করতে পারছে না আজও।

হাটে ঘুরে ঘুরে সে সেই রাস্তাটার কথাই ভাবে ও। কোনদিক থেকে সেই রাস্তা গেছে। উত্তর-দক্ষিণ পূব-পশ্চিম থেকে কাতারে কাতারে লোক আসছে!

দীপায়ন জিগ্যেস করেছে ওদের। কিন্তু কেউ খবর দিতে পারে নি। দীপায়ন চুপচাপ বসে ভেবেছে। কোথায় পায় সেই পথ। দীপায়নের সংসারে ভাল লাগে না। কেমন যেন সকলের প্রতি অনীহা। দিন দিন অসন্তোষ ক্রমশই দানা বাঁধছে। দীপায়নের কিই-বা বয়েস। এই সময়েই যদি এত চিন্তা তাহলেও তো পরের দিনগুলি কি করে কাটাবে! কলেজে পড়া শেষ করে ও আর পড়ার বই খুলে দেখে নি। কি হবে দেখে! এমন কি নভেল গল্প কবিতা কিছুই পড়ে নি ও।

আগে সিনেমা দেখতো খুব। এখন তাও বন্ধ। তপুর ধরণে ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে দেখেছে। বেড়াতে নিয়ে গেছে ফুল্ট সোলিং। ভালবেসে দেখেছে। মানে প্রেম করেছে। কিন্তু একসময় ভাল লাগে নি। ভাল লাগাতে পারে নি। তপুরা চলে গেল কালচিনি বাগানে। প্রথম প্রথম সেখানে ধাওয়া করেছে এক সময় তাও বন্ধ করে দিয়েছে দীপায়ন। নিজে নিজেই বলেছে কি হবে ওর সংগে সম্পর্ক রেখে। এই যে কি হবে? এই প্রশ্নের জবাব দীপায়ন কোনদিন পায় নি। কেন যে এই প্রশ্নটা মাথার মধ্যে ঢুকল—কি করেই বা বলবে। কেবলমাত্র সন্দেহ। সকলকেই সন্দেহ করে। সকলকে অন্যচোখে দেখে। কারোকে বিশ্বাস করতে পারে না। দীপায়ন হাটে বসে একবার নিজেকে জিগ্যেস করে। নিজেই উত্তর দেয় আবার।

বটগাছের দিকে তাকিয়েও ভাবে কিন্তু কোন উত্তর পায় না। দীপায়ন দেখেছে হাটের মতই ওর জীবন নিঃস্ব একাকী। সময় সময় লোকজন আসে নিজেদের সওদা করে একসময় চলে যায়। হাট যেমন থাকে সেই রকম পড়ে থাকে। দীপায়ন দেখেছে ওর জীবনে দিন দুপুরে অনেক লোকের আনাগোনা। যেই রাত্রি এল—'আর যেন সকলেই চলে গেল। দীপায়নকে শেষ করে। দীপায়ন আর কি করে, হাটে এসে চুপচাপ বসে নিজের জীবনের কথা, এই হাটের কথা ভাবতে ভাবতে হাটের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। নিজের বুকের ভেতর আর এক হাটের মধ্যেই।

———

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সুবিমলদা

সুবিমলদাকে আমি প্রথম দেখেছি কবে সে কথা আমার মনে নেই। তবে এটা আমার মনে আছে যে, সে সময় লোককে দেখলেই আমরা তার কি কি দোষ আছে সেটা খুঁটিয়ে খুটিয়ে বার করতাম। কলেজে পড়া শেষ হয়ে গেছে। আদর্শবাদ যে বোকা বোকা এ ব্যাপারটা আমাদের কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুবিমলদাকে সেইজন্যই বোধহয় আমার বেশ খারাপ লেগেছিল। সুবিমলদা একটা স্কুলে পড়াতেন—স্কুলটা ছিল একটা গালভরা নামের রেফিউজী কলোনীতে। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল আমার কোন এক বন্ধু। প্রথম দর্শনে সুবিমলদার চেহারা আমার মোটেও ভাল লাগে নি। বেঁটে গোলগাল চেহারা। গায়ে মোটা খদ্দরের জামা আর পাজামা। এ চেহারার লোকদের আমি স্বাধীনতার আগে প্রচুর দেখেছি। তাঁরা অত্যন্ত আদর্শবাদী ছিলেন আর আমিও তাঁদের খুব অনুরক্ত ছিলাম। দেশ স্বাধীন হলো।এইসব আদর্শবাদীদের লোভী চেহারা বেরিয়ে পড়লো। সুবিমল চৌধুরীকেও আমি তাদেরই একজন বলে ভেবে নিয়েছিলাম।

সুবিমলদার প্রতি তবু আকৃষ্ট হয়েছিলাম কারণ উনি খুব মজলিশী লোক ছিলেন। যে-কোন আড্ডায় সুবিমলদা থাকা মানেই হৈ-হৈ-র চূড়ান্ত। সকাল থেকে হল্লা চালিয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেছে এমন আমাদের বহুদিন হয়েছে। সুবিমলদার আর একটা ব্যাপার আমার কাছে বেশ ভাল লাগতো সেটা হল তাঁর অনাড়ম্বর জীবন। সুবিমলদার রোজগার ছিল খুব সীমিত। উনি গাঢ় বাদামী একটা পাঞ্জাবী সবসময় পরে থাকতেন। একটাই তাঁর পাঞ্জাবী

ছিল না আরো ছিল সেটা আমি কোনদিন জানতে পারি নি। কিন্তু এই ব্যাপারে ও'র কোন সংকোচ দেখিনি। কোনো কোনো আড্ডায় দেখেছি রঙ্গস কোনো লোক এসেছে দামী মদ এসেছে মাংসের সিঙাড়া এসেছে। নরক গুলজার। সুবিমলদা খুব রসিয়ে সিঙ্গাড়া খাচ্ছেন গেলাস বার বার ভরিয়ে নিচ্ছেন। খুব উদার গলায় আমাদের নেমন্তন্ন করেছেন ও'র বাড়ীতে। সেই রঙ্গস বন্ধুটিকে পর্যন্ত। কলোনীতে ও'র বাড়ীতে গিয়েছি। ছোট্ট ঘরে হৈ-হৈ করে আমাদের অভ্যর্থনা করেছেন। সতরঞ্চি পাতা। ও'র স্ত্রী সলজ্জ হেসে বলেছেন, 'আসুন'। তারপর আপ্যায়ন শুরু হয়েছে। ছোট ছোট ধামায় এসেছে মুড়ি আর নারকেল কুচানো। বৌকে বলেছেন তুমি অনেক নারকেল কুচিয়েছো অনেক কষ্ট করেছো কিন্তু আমাদের চা খিদে পেয়েছে। চাও কিন্তু চাই। চা এসেছে বিভিন্ন রকমের কাপে। কোনটার ডাঁটী ভাঙা কোনটার চল্‌টা ওঠা কারোর ভাগ্যে জুটেছে কাঁচের গ্লাসে। সুবিমলদা অনায়াসে আমাদের রঙ্গস বন্ধুর হাতে একটা এনামেল কাপ তুলে দিয়েছেন। আমাদের বেশ মজাই লেগেছে। আমাদের আড্ডা বেশ লেগেছে। বৌদিকে ভাল লেগেছে। কিন্তু সুবিমলদাকে দু কারণে ভাল লাগেনি। প্রথম আমার মনে আদর্শবাদীর যে চিত্র আছে তাতে মদ্যপানের স্থান নেই। সুবিমলদার মদ্যপানে শুধুমাত্র যে অনীহা নেই তা নয় রীতিমতো উৎসাহ আছে লক্ষ্য করেছি। দ্বিতীয় কারণ আমরা যখন দেশোদ্ধারের বিভিন্ন উপায় নিয়ে তুমুল তর্ক করেছি তখন সুবিমলদার হঠাৎ কোন কাজ মনে পড়ে গেছে ; আড্ডা ছেড়ে চলে গেছেন।

একটু ঘনিষ্ঠতা হতে একদিন জিজ্ঞাসা করেছি, সুবিমলদা আমরা যখন দেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি তখন আপনি যোগ দেন না কেন। কেন উঠে যান? অথচ আপনি তো প্রথম যৌবনে বিপ্লবীদের সঙ্গে ছিলেন বলে শুনেছি। সুবিমলদা হেসে জবাব দিয়েছেন তোরা কত পড়াশোনা করেছিস কত গুছিয়ে কথা বলতে পারিস। আমি তোদের সঙ্গে পারবো কেন? তোরা যে দেশ দেশ করিস ও দেশ আমি বুঝি না। আমাদের ভারতবর্ষের বিরাট আয়তন। বহু তার ভাষা। আমি কতটুকুই বা জানি? আমি কখনো লিলুয়ার পশ্চিমে যাই নি। বাংলা ছাড়া কোন ভারতীয় ভাষা জানি না। আমি কি করলে কেরলের লোকদের ভাল হয় কি করে জানবো? আমি জিজ্ঞাসা করেছি আপনাকে লোকে আদর্শবাদী বলে। আপনার আদর্শবাদের

মধ্যে দেশের প্রতি মমত্ববোধ নেই। সুবিমলদা হেসেছেন বলেছেন কে বললো নেই। তবে ওই যে বললাম আমি বেশী পড়াশোনা করিনি তোরা কি সব সাংকেতিক ভাষায় কথা বলিস আমি বুঝি না। আমি বুঝি যে, আমি নিজে খাঁটি থাকবো। আমার যে দায়িত্ব আছে পালন করবো। আমার পরিবারের প্রতি, আমি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করি তার প্রতি আমার দায়িত্ব পালন করবো। বন্ধুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবো না। আমি বললাম মাক্সিসম বলে— সুবিমলদা আমায় থামিয়ে দিলেন বললেন—তোকে যে বললাম সাংকেতিক ভাষা আমি বুঝি না।

আমার মনে হল সত্যি সুবিমলদার গণ্ডী বড্ড ছোট্ট। আজকের বিশাল দুনিয়ার পক্ষে সুবিমলদা বেমানান। সুবিমলদা-বৌদি তাঁদের সংসার আর ছোট্ট স্কুল নিয়েই কাটিয়ে দেবেন। ছেলেদের নীতিশিক্ষা দেবেন, চরিত্র গঠন করবার চেষ্টা করবেন। একেবারে সেকেলে।

সুবিমলদার জন্যে দেশ বসে থাকে নি। গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। দেশে এসেছে রাষ্ট্রবিপ্লব। একদল ছেলে, কিছু বয়স্ক ব্যক্তি হঠাৎ পাগল হয়ে গেল। তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে সুরু করলো দেশকে তারা রাতারাতি বদলে দেবে। দেশকে একমাত্র তারাই বোঝে আর বোঝেন চীনের চেয়ারম্যান। সুরু হলো খুনোখুনি। একদল লোক দেশকে ভালবাসে বলে দেওয়ালে লিখতে সুরু করলো—চীনের পথ আমাদের পথ। আর একদল লোক তারাও দেশকে ভালবাসে বলে এদের বাধা দিতে সুরু করলো। দু দলেই লোক মরতে লাগলো। বেপরোয়া ছেলেরা মূর্তি ভাঙলো, বোমা ছুঁড়লো, পরীক্ষা ভণ্ডুল করলো স্কুলে কলেজে। শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার নামে আরেকদল করলো সমান নৃশংস ব্যবহার। আমরা যারা কোন দলে ছিলাম না শুধু দেশোদ্ধারের নানা উপায় ভাবতাম তারা তাত্ত্বিক আলোচনা করতাম। বলতাম বেপরোয়া ছেলেদের পন্থা ভ্রান্ত কিন্তু ওরা খুব মেধাবী ছেলের দল। ওদের পথপ্রান্ত কিন্তু যা বলছে তা ঠিক। বলতাম ওরা ভীষণ আদর্শবাদী।

সুবিমলদার পাড়াটা সে সময় দল লড়াই-এর আখড়া ছিল। দেশের সরকারের আইন সেখানে খাটত না বিশেষ। বোমাবাজী যারা চালাত তারাই ঠিক করে দিত পাড়া বন্ধ হবে কি হবে না। এই সময় আমার সুবিমলদার সঙ্গে দেখা হ'ল লর্ড সিন্‌হা রোডে কলকাতা পুলিশের বিশেষ দপ্তরে। তখন

যে ভদ্রলোক এই বিভাগের কর্তা ছিলেন তিনি পড়তেন আমার সঙ্গে একই কলেজে। ওর সঙ্গে আবার বিয়ে হয়েছিল আমার ছোটবোনের বান্ধবীর। দু তরফা সম্পর্ক। ওদের খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি সুবিমলদাও বাড়ী থেকে বেরুচ্ছেন। আমি প্রশ্ন করলাম এখানে কি করছেন সুবিমলদা? বললেন আমি এখন স্কুলটার হেডমাস্টার। আমাদের একজন শিক্ষক এই বোমাবাজীর দলের লোক বলে পুলিসের সন্দেহ। পুলিশের ধারণা আমি নাকি শিক্ষক কোথায় আছেন জানি। তাই দিনের পর এঁদের অতিথি হয়ে আসি, সাত/আট ঘন্টা ধরে জেরা চলে। তবে দুটো ভালো জিনিস হচ্ছে। রোজ ভোরে উঠছি আর দেদার বিনা পয়সায় গাড়ী চড়ছি। তারপরই বললেন যাই রে, স্কুলের অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। ভেতরে গিয়ে বন্ধুটিকে বললাম সুবিমলদাকে তোমাদের কি দরকার। বন্ধুটি বললো তোমার সুবিমলদা একখানি ঘোড়েল লোক। সুবিমলদাকে ঘোড়েল কখনো আমার মনে হয় নি। প্রশ্ন করলাম কেন। বললো ও পাড়ার এ্যাকশন স্কোয়াডের লীডার প্রবীর রায়ের খবর ও সব জানে কিন্তু কিছু বলে নি। এক উত্তর—প্রবীর রায় আমার সহকর্মী। ভাল ছাত্র ছিল ভাল শিক্ষক ছিল। তার সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছে আমার। কিন্তু সে কোথায় আছে কি করছে আমায় প্রশ্ন করবেন না আমি উত্তর দেব না। আমরা আটদিন ধরে কিছুতে এর বেশী বার করতে পারি নি।

সুবিমলদাকে শেষ দেখলাম পি. জি. হসপিটালে। বোমা আর পাইপ গানের গুলিতে শরীর ক্ষতবিক্ষত। রক্তের দরকার বলে আমার কাছে খবর এসেছিল। খবর এনেছিল প্রবীর রায়। গভীর রাতে আমার ঘরে টোকা পড়লো। রাস্তার ওপর ঘর বলে মাঝে মাঝে কেউ কেউ মজা করতে টোকা দিয়ে যায়। দ্বিতীয় বার টোকা পড়ল যখন তখন দরজা খুলতে দেখলাম একটি অপরিচিত লোক। আমায় বললো সুবিমলদা সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিলেন। আমরা মারতে চাই নি। সুবিমল যে এমন অবুঝ জানতাম না। আপনি হাসপাতালে যান। সেখানে গিয়ে বৌদির সঙ্গে দেখা হল। বেশী পড়াশোনা না জানা স্ত্রীলোকটি ইস্পাত দিয়ে গড়া। কোনো চঞ্চলতা নেই। বললেন ঠাকুরপো রক্ত দরকার—দেবেন? আমি সঙ্গে সঙ্গে বন্দোবস্ত করলাম।

বৌদির মুখে ঘটনাটা শুনলাম। বৌদি আমার বর্ণনা শুনে বলে দিলেন যে ছেলেটি আমায় খবর দিতে এসেছিল সেইই প্রবীর রায়। ওকে সুবিমলদা লুকিয়ে রেখেছিলেন বৌদির বাপের বাড়ীতে। এর মধ্যে সুবিমলদা হঠাৎ

শুনতে পান ছেলেরা এরপর এ্যাকশন নেবে ওরই স্কুলের ওপর। স্কুলে ঢুকতেই বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দর যে তিনটি মূর্তি আছে তাদের খতম করা হবে। খবর আসতেই সুবিমলদা চলে যান স্কুল গেটে। স্কুলের অন্যান্যরা হঠকারিতা করতে বারণ করেছিল। (ভারী মজার এই শব্দ হঠকারী)—যে ভাঙে সেও হঠকারী যে রুখতে চায় সেও হঠকারী) সুবিমলদা শোনেন নি, ছেলেরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারা জানত প্রবীর রায়কে পুলিশের হাত থেকে সুবিমলদাই রক্ষা করেছেন। তাই তারা বোঝাতে চেয়েছিল সুবিমলদাকে। উনি বুঝতে চান নি। বলেছিলেন আমি এ হতে দেব না। ওঁদের আমি বিশ্বাস করি। ওঁদের আমি সম্মান করি। স্কুলের কেউ বোধহয় পুলিশে খবর দিয়েছিল। হঠাৎ পুলিশের গাড়ী এসে পড়ে। খণ্ডযুদ্ধ সুরু হয়। ছেলেদের বোমা, আর গুলি আর পুলিশের বুলেট দুইই সুবিমলদার গায়ে লাগে। কুম্ভ নকল বুঁদিগড় রক্ষা করতে পারেন নি কিন্তু সুবিমলদা পেরেছিলেন। আমার রক্ত দেওয়া কিন্তু বৃথাই গেল—সুবিমলদা সে রাত্রেই মারা গেলেন।

———

• কবিতা

সুশীল রায়

পূর্বপুরুষ

হে পূর্বপুরুষ ! তোমরা পৃথিবীর প্রাক্তন অতিথি
সকলে গ্রহণ করো আমাদের স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা-প্রীতি ।
ইচ্ছে করে জেনে নিতে তোমাদের আচরণ-বিধি
জরিপ করার ইচ্ছে তোমাদের মনের পরিধি ।
আমরা বংশধর তোমাদেরি ; কিন্তু প্রকৃত আত্মীয়
আমরা কি তোমাদের ? যদি পার নিভৃতে জানিয়ো ।

কিসে যে কল্যাণ হবে, আমাদের ভালো হবে কিসে
অবশ্যই চেয়েছিলে ; তোমাদের মঙ্গল-আশিসে
পরিপূর্ণ করেছিলে ।—কোনোই সন্দেহ নেই তাতে
"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে"
এ প্রার্থনা জানিয়েছ সেকালের অন্নদার কাছে
এ দৃঢ়বিশ্বাস মনে আছে ।

অথচ, অথচ, তুমি, হে পূর্বপুরুষ,
শ্মশান-সমাধি থেকে উঠে এসে দেখে যাও
একবার একাল চাক্ষুষ—
আমরা কেমন আছি, ভালো আছি কিনা,
বিফলে গিয়েছে কিনা দেবতার পায়ে দেওয়া
তোমাদের সমস্ত দক্ষিণা ।
আকাশের রং অবশ্যই আছে নীল
সবুজ বর্ণের সমারোহে পূর্ণ রয়েছে নিখিল ।।

বয়স

এই একটা বয়স যার কৌতুক আমাকে
ছুটিয়ে নিয়ে যায় এপাশ থেকে ওপাশ
শরীরে এবং মননে ।
মাঝরাতে জেগে উঠি···জেগে স্বপ্ন দেখবো বলে···
হাজার স্বপ্নের ভিতর আমার দক্ষিণ তর্জনীতে
ছিটকে এসে পড়ে রৌদ্র বিন্দু···
পেটের ভিতর ক্ষুধা
আমি বয়স ভুলে যাই ।

এমনই একটা বয়স
জাগরণে অনতিক্রোশ দূরে থাকে আগুন
প্রতিজ্ঞার মতো আমি, তা জোর করে দেখে আসি ।

আগুন আমার শুদ্ধির জন্যে অপেক্ষা করে থাকে—
সাঁকোর ও পাড়ে
কেবল সাঁকোর এ পাড়ে এই বয়স
যা আগুনের মতো ফুলওয়ালা কৃষ্ণচূড়ার ডাল
যা বার্ধক্য সইতে পারে না ।

এই বয়সই অমায়িক, ফেলে দেয় তার
অস্ত্রশস্ত্র এবং শিরস্ত্রান
বয়স ভুলে যাই···পেটের ভিতর ক্ষুধা
থাকে আমৃত্যু ॥

সুচেতামিত্র

ইন্দ্রনাথের বাঁশি

কতদূর
কোন্ অন্ধকার থেকে কারা আসে
কারা যেন বুকের ভিতরে আসে
তীব্র ছাপ রাখে, তীব্র স্পষ্ট
সুতীক্ষ্ণ স্পর্শের মতো ছাপ রাখে কারা ?
আমি ঘুম থেকে জাগি
ইন্দ্রনাথের বাঁশি ও কি ?
অন্ধকার বনে বনে
ঘুমের অতল থেকে টেনে তুলে
কে ডাকে এমন ?
কোন গ্রাম শস্য ক্ষেতে বিস্তীর্ণ জঙ্গলে ঢাকা পড়ে আছে
সব চিত্রগুলি।
আমি চোখ খুলে দেখি
গভীরে ছড়ানো সুর দৃষ্টির বাহিরে
আমার জগৎ ছেড়ে দূরে বহুদূরে।

তবু কাছে আসে কারা ?
কেন তারা বুকে রাখে হাত ?
সেই উষা, অচলা, কি রমা
সাবিত্রী, কিরণময়ী
সুমিত্রা, ভারতী কিংবা রাজলক্ষ্মীরা
বার বার উঠে আসে
বার বার শ্রীকান্তের নির্লিপ্ত দৃষ্টির চিত্রপটে
তারা আসে—ছবির চেয়েও তীব্র ইন্দ্রিয়জ ভাবে।
আমাকে রাখে না স্থির
চোখের জলের চেয়ে আরও কিছু
ঘন অনুভূতি স্মৃতি বিদারিত করে।

আসলে সত্তার মূলে যে-প্রাণ গভীর
সে আমাকে করে প্রতারণা
হারাতে হারাতে থাকি কেবলই প্রত্যয়।
এমন সময় সহসা বাতাসে শুনি
ঘুমের অতল থেকে টানে
ইন্দ্রনাথের বাঁশি।

তারপর একে একে কারা উঠে আসে
বুকের ভিতরে রাখে হাত
মনের অতলে রাখে হাত
ঘুমের অতলে রাখে গাঢ় অনুভূতি !

প্রণব মাইতি

চিরন্তনী

আমার বাঁ পাশে শুয়ে চিরন্তনী সৌমিত্রা রমণী
তাকে কি জাগিয়ে দিয়ে দেখাবো শ্রাবণ বর্ষা
তার স্বপ্নে মেঘময় দুঃখ ধান বুনে দেব,
জাগলে স্পর্ধিতা নারী সুফলা ধরণী

অসফল সূর্যরশ্মি প্রাত্যহিক জেগে উঠবে
সধূম চায়ের কাপে সে আনবে প্রার্থিত ভোর
অসফল রাত্রিশেষে বন্ধ্যা স্মৃতির সাথে
মানুষ কী হাত পাতবে অনির্দেশ রমণীর দিকে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

অনুমান

ফুল ভেবেছিলাম, কিন্তু ফুল নয়
তারপর ভাবলাম কুয়াশা,
কিন্তু সামান্য উরাল পাখি
ডানা ঝাপটিয়ে তা সরিয়ে দিল

দেখা গেল পুষ্করস্নাত সূর্য তাও
অল্পেই টুকরো হ'লো নিশিনক্ষত্রের লক্ষ লক্ষ ভাগে !
অবশেষে ভাবলাম কবিতা

কিন্তু শব্দ একবারো তার
বাড়ির নম্বর জানালো না ।

স্বপন ঘোষ

আকাশের ইচ্ছা

আকাশের ইচ্ছা ছিলো
—আমি বড় কবি হবো ।
কিন্তু অনেক কবিতার
জন্ম দিয়ে গেলো—
আমার মায়েরই মতোন ।
রূপকথার মতো—
রূপসী কান্নার রূপ ধরে
একা একা দাঁড়িয়ে
—কেবল অপেক্ষা করে
ভাবে, কবি আমি তোমার মতো
আরো অনেক বেশী
—উদার হবো ।

শুভ্রা চক্রবর্তী

শিকারীর ভূমিকা নেপথ্যেই থাক

আমরা তো সব—অকাল প্রাজ্ঞ
টপকে টপকে গেছি—মাস—বছর—দিন
অনেক অনেক বার—।।

দৃষ্টির দর্পণে দেখি
পিরামিড সময়ের ঘরে

থরে থরে সাজানো
একই ইতিহাস

ক্রীতদাসের পিঠের সহস্র ক্ষত
এখনও অবিকৃত ।।
ভগ্নাংশের সিঁড়ি বেয়ে দেখি
উত্তর মেলেনি আজও
মিলবে কি কোনোদিনও ?

বুঝি মমি হয়ে গেছে
পনেরো আঠারো কিংবা
পঁচিশের ভাবনাগুলো
মুষল পর্বে তাই ফেউ ডাকা রাতে
শিকারী ভূমিকা—নেপথ্যেই থাক ।।

অর্ণবজ্যোতি দেব

আমার পথকে

মাঝে মধ্যেই আমার পথকে বিরক্ত করে এক একটি পাহাড়
সঙ্গে সঙ্গেই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আত্মবিশ্বাস ।
আমার দুপায়ে তখন সমতলভূমির সাধনা ।
অবশেষে এই কঠিন পাহাড় খাটো হতে হতে…
আমার পায়ের নীচে ঠেকিয়ে দেয় তার মাথা ।
আর ঠিক তখনই—আমার জয়কে দুই হাতে
জড়াবে বলে দমকা হাওয়ার মতো ছুটে আসে অহংকার
আলিঙ্গন করা দূরে থাক । বরং আবর্জনার মতো—
পরিত্যাগ করি । গতির কি শেষ আছে !
ফের আমার পথকে যদি বিরক্ত করে আরও একটি পাহাড় ।

দীপক কর

ভীষণ ঈর্ষে হয়

আমায় ভীষণ ঈর্ষে হয়
বালিশের কোলে
তোমার অই
আলুথালু কান্না
ভাল্লাগে না।

অথচ
নিমেষে-ই প্রভাত হয়
আমার এ কঠিন-কোমল বুক
কাছে এসো
তোমার আর্দ্র জবাকুসুম-মুখ।
তুলে নিক্ হৃদয়ের নিদ্রিত উত্তাপ।

ক্ষিতীশ দেব শিকদার

উপবাসী

পোষাকে আষাকে স্ফীত হ'চ্ছে
আভিজাত্যবোধ—খানায়পিনায় গুরুপাক
সৌন্দর্যরসিক সাজি মালি-রেখে রচিত উদ্যানে
দাম্ভিক জ্ঞানীর মতো বই কিনে ভরে রাখি তাক—
চুলে মাখি লক্ষ্মীবিলাস—
দূরে গেলে উড়ে যাই শব্দ-গতি সম্ভ্রান্ত বিমানে
জীবনে তবুও থাকে ফাঁক—

এক চোখে প্রতিপত্তি অন্যচোখে নিরম্বু উপবাস।

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

নিখুঁত প্রতিমা

শিল্পের প্রতিমা গড়া ভাস্কর্যের নিপুণ গঠনে
চিত্রের চারুতা থাকে পটে তুলি রেখার ধরনে
নদীর জলের ঢেউ অথবা আকাশে মেঘ-তুলো
বাতাসে ফুলের ঘ্রাণ অথবা পলাশের রঙ্গুলো।
তার শোভা মনে ধরে ধনী সেজে সুন্দর বিভাসে
প্রকৃতির জলেস্থলে আলোকালো বিচিত্র প্রকাশে
একান্ত চৈতন্য চেনে বিভাবতী বর্ণাঢ্য দর্পণে
আত্মস্থ মানসমূর্তি ধরা দেয় অপার দর্শনে।

বসন্ত আবীরে কেন প্রদীপ্ত প্রকৃতি রাঙা হয়?
সৌন্দর্যের অভাবিত রূপের উজ্জ্বল পরিচয়—
দৃশ্যের শোভন মুখ উদ্ভাসিত নিজেকে দেখার
ইচ্ছাটুকু পদ্মকলি-দল খুলে ফুটন্ত রাখার

অথচ থাকছে কেন ত্রুটি ছিদ্র অন্বেষার মন
অনুভূতি গভীরের চেতনা থাকুক অন্বিক্ষণ—
নিজের দীনতা ঢেকে খুঁজে ফেরা অপরের খুঁত
অথচ কে ভাবে তবু গড়ে তোলা নিজেকে নিখুঁত।

কবিরুল ইসলাম

একা-একা

বোধ হয় কথাটি এই; আমার সঙ্গে তুমি থাকো
নাকি তোমার সহিত আমি থাকি? সঠিক জানি না।
বরং কথাটি হচ্ছে একসঙ্গে থাকা, মানে সহবাস ঃ
অন্তত একই ছাদের নীচে এই যে ব্যবস্থাপত্র
কিংবা অব্যবস্থা যাই বলো!
এক সময় চিঠি আসতো বালিকা বয়সে
এখন আসে না। নিজেরাই জ্যোৎস্নার ডাকবাক্স—
জ্বলন্ত জ্যোৎস্নার যুবতীরা

কেউ আর পাশপোর্ট ভিসার জটিল জঙ্গলে
চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে-কলকাতা আসে না।

নরনারী শুধুই শরীরে মেলে। দ্যাখো একই খাটে
বিষুবরেখার দুস্তরতা উত্তরে দক্ষিণে বাড়ে, ক্রমশই বাড়ে।
তাই কে কার সহিত থাকে কিংবা একসঙ্গে থাকে কি না
বলা চাট্টিখানি কথা নয়।

আসলে প্রত্যেকে একা-একা একলা থেকে যায়।।

নির্মলেন্দু ভট্টাচার্য

ইতিহাস কাঁদে

ঈশ্বরের কাছে আজ শতাব্দীর পরিচয়
দিতে লজ্জা লাগে। পৃথিবীর মেকী ভালোবাসা
মেরামত করার কৌশল
রাস্তার প্রতিটি মোড়ে শ্লোগান, জটলা
এগুলো ঈশ্বরের কিন্তু ভিউফাইন্ডারের বাইরে।

ধ্বংসস্তূপের তলায় পড়ে গিয়ে সব চাওয়া পাওয়া
আশা-নিরাশার স্বপ্নগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে
অতল গহ্বরে। প্রাণের প্রতিষ্ঠা নেই
নিজস্ব-নির্মাণে রক্তমাখা ইতিহাস শতাব্দীর
গায়ে লেগে আছে ;
হায়নার হানাহানি চলছে এখানে দিনরাত
আর ক্যাবারেতে চলছে
'মিস ববির' ড্যান্স—
শতাব্দীর লজ্জায় মাথা কাটা গেছে।

অস্তিত্ব বিপন্ন বলে—
শতাব্দীকে ডেকে নিয়ে ঈশ্বর পালিয়ে গেল
নবীন অঙ্কুরগুলোর ওপর পা মাড়িয়ে।

পলাশ মিত্র

অথচ ভোরের হাওয়ায়

কার কাছে কোন্ ত্রুটি
কোন্ অপরাধ ঃ
আমার অশান্তি আমি নিজেই কি ডাকি ?
অথবা অন্যতর কোনও
গভীর উৎসে
যন্ত্রণার জন্ম কিনা
এ এক জটিল হিসেব ঃ
ভালোবাসা চেয়ে কেন ফিরে আসি
অথবা
সব দিয়ে কেন দুঃস্বপ্নে
ভারি হয় রাত
এ যেন অনন্ত বিস্ময়।

অথচ ভোরের হাওয়ায়
আমিও দুলে উঠতে ইচ্ছা করি ঃ
শিশিরের ছোঁয়া নিয়ে
আমিও উন্মনা হতে চাই।

তবু কেন ভারি হয় রাত ?

অসিতবরণ হালদার

স্বর্গের তটিনী

কে কতটা নত হবে, যেন সব স্থির করা আছে।
যেন প্রত্যেকেই তার উদ্বৃত্ত ভূমিকা অনুযায়ী
উজ্জ্বল আলোর নীচে হয়।
সম্রাট, সৈনিক, বেশ্যা, যাদুকর, শিল্পী ও কেরাণী,
কবি, অধ্যাপক কিংবা মাংসের দোকানে
যাকে নির্বিকার মুখে মৃত ছাগলের চামড়া ছাড়াতে দেখেছি,

এবং গর্দানে-রাংয়ে যে তখন মগ্ন হয়েছিল,
তারা প্রত্যেকেই আসে উজ্জ্বল আলোর নীচে একবার।
কপালে স্বেদের বিন্দু, সানন্দ সুঠাম ঘুরে গিয়ে
তারা প্রত্যেকেই নত হয়।

কেউ বেশী, কেউ কম, কিন্তু প্রত্যেকেই নত হবে
উজ্জ্বল আলোর নীচে একবার।
না-কেনা না-বেচা পণ্য, স্বর্গের তটিনী
সারাদিন জ্বলে ;
এবং সৈনিক, বেশ্যা, কলাবিৎ, ভাড়াটিয়া গুণ্ডা, কারিগর
একবার সেখানে যায়, যে যার ভূমিকা অনুযায়ী
নত হয় ; স্বর্গ থেকে প্রলম্বিত আলোর সলিলে
মুখ প্রক্ষালন করে নেয়।

অরুণ ঘোষ

উচ্চকিত ভালোবাসার গান

জ্যাকেলিন তোমাকে ধন্যবাদ
বিভিয়ান তোমাকেও
তোমাদের সূর্য্য প্রদক্ষিণ
তোমাদের ঘরের সন্ধান
ঠিক ঠিক জেনে গেছো আজ।

সভ্যতার করতলে মুখ ঢেকে সন্ধ্যা নেমে আসে
হায়নার দল চুপি চুপি পথ হাঁটে
জ্বলন্ত চোখে মাংসের নেশা।

জ্যাকেলিন তোমাদের প্রতিবাদ সেখানেও নয়
তোমাদের ধর্মীয় আচারে নিঃসীম অন্ধকার
অথচ গভীর গভীরতর সত্যের সন্ধান।

বিভিয়ান তোমরা জেনে রাখো, যাজকের দল
মানুষের হাত ধরে একদিন সরাইখানার দিকে
নিষিদ্ধ পল্লীর পথে নেমে যাবে।

সেদিন শেষ হয়ে যাবে করুণতর নিষ্ঠুর প্রতিবাদ
শুরু হয়ে যাবে প্রার্থনা সংগীত
তোমাদের উচ্চকিত ভালবাসার গান।

সুশীল পাঁজা

আলো অন্ধকারের মেলা

প্রকৃতির কোলে গাঢ় সূর্য
দিগন্তের সব কাজ সেরে
সমুদ্রের নীল জলে ডুবে যায়।

ছলাৎ ছলাৎ শব্দে
নির্জন নদীতীরে
নামে গাঢ় অন্ধকার।

নারকেল কুঞ্জ, খেজুর, তাল বৃক্ষ
সরলরেখায় পাশাপাশি জেগে থাকে
ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে যুগে যুগে
ঝড়, বৃষ্টি, প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষে।

প্রকৃতির সৌন্দর্য বাড়ায় বনতল
বনতলের ভিতর বনতলে
আলো অন্ধকারের মেলা।
অন্ধকারে খেলা করে
আদিম পশু-পাখী
নিজস্ব সীমানায়।

তারাপদ রায়

আপত্তি নেই

আপনারা আরেকটু সামনের দিকে যাবেন,
তারপর গোলাপি রঙের বাড়ি
তারপর মাঠকোঠা
ঐখানে আমার নাম ধরে ডাকবেন
একটা কুকুর খুব চেঁচাতে পারে
গ্রাহ্য করবেন না
কোনো অসুবিধে নেই
যত ইচ্ছে আমার নাম ধরে ডাকবেন
আমি ঐ বাড়িতে এখন থাকি না
কোনোদিন ছিলাম না
আপনারা ওখানে গিয়ে আমার খোঁজ করবেন
কোনো অসুবিধে নেই
আমার কোনো আপত্তি নেই।

প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ

পরিব্রাজক

পরিক্রমা অন্তহীন দুরান্ত দেশে কোথা যাবে ভিক্ষুক শ্রমণী
ছদ্মবাসী তুমি কি নারী অথবা নিষ্প্রাণ পুতুল,
এখনো হলো না চেনা এতদূর পথ
একসঙ্গে এলাম, মনুমেন্ট ছেড়েছি সেই
ঘন্টা তিন আগে, রকেট কোচের পাশে
চলন্ত নিসর্গমালা ঘন দীর্ঘ নারকোল বন
মাটিরঙ নিকোন কুটির গোলপাতা ছাওয়া
খড়ের হলুদ চালে অচেনা পাখীর নাচানাচি
আমার বাঁ ধারে জানলার চৌকো ছুঁয়ে

যুবক অথবা কিশোর তুমি কি আমাকে জানো
ডিজেলের একটানা গর্জন নিয়ে আসে অয়েল জেটি
জলের স্বচ্ছ নরম সরে খনিজ তেলের স্তর ভাসে,
তাতেও সূর্যের খেলা তেলরঙ চিত্রের নির্মাণ,
পেঁছে যাই দূর বালিয়াড়ি যেখানে তীক্ষ্ণ
বালুকণা অভ্রের নিয়মে অবিকৃত জ্বলে
ত্রিভুজ তৈরী করা বিন্দুশেষে দুবাহু ছড়ায়
দিগন্তকে ছিঁড়ে নেয় কল্লোলিনী মোহনা সুন্দরী
অন্তহীন পরিব্রাজক তোমার ভ্রমণ শেষ হবে কবে,
আমি দেবো হৃদয় কলস থেকে শীতল পানীয়।

সুধীর সরকার

বিলাপী মন

দ্বার হতে দ্বারে, ফিরি সন্ন্যাসীর বেশে,—
তোমারই উদ্দেশ্যে।

শিশুকালে রেখে মোরে মুদিলে নয়ন,
হৃদয় কান্তারে মোর জ্বলে হুতাসন।
আবদ্ধ বিহঙ্গ যেন খোঁজে পারাবার,
তোমা লাগি মন মোর করে হাহাকার।
চাতক বারিটি চাহে বসন্তের সনে,
তোমা লাগি নীর ঝরে নয়নের কোণে।
হাল বিনা তরণীর যেই দুর্গতি,
তোমার বিহনে মোর সেই অবনতি।
থাকিতে বাসনা নাই আকাশের তলে
নিয়ে চল মোরে, তুমি যেথা গেছ চলে।
সমান বয়সি সবে, 'মা' বলিয়া ডাকে,
বাসনায় ভরে প্রাণ, আমি ডাকি কাকে?
কোথায় জননী তুমি, ডাকিবো কাহারে,
তোমার উদ্দেশ্যে ফিরি দ্বার হতে দ্বারে।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

ফেরা

যদিও তার বন্ধদ্বার অন্ধকার রাত
প্রত্যাশায় অপেক্ষায় দিনযাপন ভালো
হয়তো ভুলে যেতেও পারে খুলে অকস্মাৎ
যেহেতু জাগে শুভ্রসতী সরস্বতী আলো।

কপালে ঘাম—দীর্ঘতম রাস্তা শুয়েছিল
তবুও আমি ছুঁয়েছিলাম—অচেনা সাবলীলও
বন্ধু হল—ছড়িয়ে দিল ছায়া দীর্ঘতর
মরুভূমির মধ্যিখানে তৃষ্ণা সরোবরও।

শুভ্রসতী সরস্বতী আলো জাগেন দূরে
বীজ ফুটেছে সম্ভাবনা শ্রবণে অংকুরে
অনেক রাস্তা ঘুরে এখন ফেরা হৃদয়পুরে……

অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়

তবুও তারা

আমাদের রূপসী সে
ছন্দের বাঁধ ভেঙ্গে
বহুদূরে চলে গেছে হাট পেরিয়ে।
আমাদের রেলগাড়ী আজো থামে
হরিপুর জংশনে-টংশনে
একটু আরামপ্রিয় যাত্রী নিবাসে।

কেমন গান্ধারী দেখো
চোখ বেঁধে বলে দেয় যুদ্ধের খবর
ট্রামের চাকার তলে পিষ্ট হয়
বাঙালী কবি—
পাঠক জেনেও তবু ভেতরে ঢোকে না,

দরদ উছলে পড়ে
আমাদের রূপসীর।
শরৎ হেমন্ত থেকে বসন্ত এলো
আমাদের রেলগাড়ী বাড়ায় না গতি।

সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

কাপালিক, ঝড় ও মানসী

কাপালিক ঝড়কে আমার বড় ভয়
এ রকম একেকটা ঝড়ে যাবতীয় নক্ষত্র মুছে যায়
উগরে ফেলে কল্পতরু বৃক্ষের মূল দামাল ঘোড়া
বীজাণুর মতো সমূহ দুঃখ গ্রাস করে চিত্রিত সুষমা
গলাবন্ধ জলে নাভিশ্বাস ওঠে সোনালী ইচ্ছার।

এ রকম সময়ে আকাশ থেকে রোদফুল হয়ে
কোন মৃগনয়না কিশোরী নেমে আসুক
মানসী, তোমার সূর্যরথে আসন রাখ আমার জন্যে
আমার বিষণ্ণ করতল ভরে দাও নয়নতারা প্রিয়ফুলে
ঝড়ের কাছে নতজানু হবো না আর
বরং লড়াকু ঘোড়ার মত যুঝে যাব
সম্যক অক্ষত রাখব নিজস্ব জমির আল।

কুমারেশ চক্রবর্তী

ভালোবাসার যাত্রী

ঘুরে ফিরে মনোরেলে চলেছি
ভালোবাসার রাজধানী একসপ্রেস।
বহু শস্য-শ্যামলা ক্ষেত, ফুলে ফলে ঢাকা
বাগান, রঙিন সরোবর, দুরন্ত নদী
পেরিয়ে এলাম। পেলাম অন্ধকার রাতে
বহু জোনাকীর হাতছানি, দূর আকাশে

শান্ত তারকার আলো।
অথচ নামা হলো না কোথাও
কোন স্টেশন পড়ল না চোখে।
মাঝে মাঝে গাড়ী থামে লাল সিগনালে
স্টেশন থেকে বহুদূরে কোন মরুদেশে
কিংবা স্টেশন পেরিয়ে হিংস্র জংগলে।

ভ্রমণ ক্লান্ত এখন আমার মন
তৃষ্ণায় ছাতিফাটা বুক
এখন প্রয়োজন একটা স্টেশন
অথচ কোন দুর্ঘটনা।

সমীর চট্টোপাধ্যায়

সূর্য প্রদক্ষিণে তোমার ছায়া

একদিন এই শরীর ছেড়ে যেতে হবে দূরে সূর্য প্রদক্ষিণে
কোথাও সন্তর্পণে, এলোমেলো অগোছালো ভাবে
তেঁতুল গাছের পাতার মতো শিরশিরিয়ে কেঁপে ওঠে চোখ,
দু'হাতে ভিক্ষের ঝুলি
বুশ শার্টের বোতাম খুলে হৃদয়ের কাছে পৌঁছে যায়
দুরন্ত বাতাস

একবার পৃথিবীর মাটি ছুঁয়ে দেখি অবোধ শিশুর মতো
পথের মোহনায় নিজের শরীর
পাতাবাহার গাছে চিক্‌মিকিয়ে ওঠে সূর্য ছায়া ছায়া
শালিখেরা খুঁটে খায় সুখ ভালবাসা

সূর্যের চারদিকে ঘোরে শৈশবের দুরন্ত রাখাল
অনন্তকাল এক বাঁশী ডেকে যায়
অনন্তকাল
প্রদক্ষিণে কারো ছায়া দেখি, অনুভবে সূর্য
তোমার হৃদয়ে ছুঁয়েছি তবে কোন্ শৈশবে!

অপরাজিতা গোপ্পী

আলোহীন পৃথিবী

প্রতিমুহূর্তে ভীরুতার নাগপাশে
জীবনটা জড়িয়ে জড়িয়ে
আমরা হ'তে চেয়েছি
সার্থক, পরিপূর্ণ।

লক্ষ কোটি নক্ষত্রের
বিচ্ছুরিত আলো হ'তে
যে আলো
অণু-পরমাণুর বুকে
নিত্য—উজ্জ্বল,
সে আলো
ভীরুতার দাক্ষিণ্যে
চায় না বেঁচে থাকতে।

আলোহীন পৃথিবীতে
যদি আলোর উৎসবের
থাকে প্রয়োজন
তবে ভীরুতার বর্ম ছেড়ে
নির্ভীক আত্মপ্রত্যয়ের
আছে প্রয়োজন।

দীপক সরকার

সুবর্ণরেখা

দীর্ঘ প্রান্তর জুড়ে, প্রকৃতি, তোমার প্রেম
বড় অপলক স্থির হয়ে আছে!
সম্মুখে দূরে
উৎক্ষিপ্ত নৈঃশব্দে কুন্দ শুভ্র জ্যোৎস্না বেগবতী।
অলৌকিক প্রতিভাসে কাদের আঁচলে ওড়ে শ্বেত পারাবত।

তারা কারা ? নিয়ত অস্তিত্বে কাদের
বিষণ্ণ সংকেত—চলে যেতে হবে, চলে যেতে হয়—অদূরে
সুবর্ণরেখা ক্ষীণ বয়ে চলে।

শাশ্বতী দেব

এত ঢেউ করতলে

একগুচ্ছ রজনীগন্ধা তুমি
কিংবা একগুচ্ছ গোলাপের ঘ্রাণ হৃদয়ে মিলায়
আমি জানি না আমার স্মৃতিপটে
কি করে সেই ছবি এঁকেছি
পেয়েছি সেই ঘ্রাণ।

মাঝে মাঝে মনে হয়
এত সুখ আনন্দের এত ঢেউ
আমার এ করতলে কি করে যে রাখবো ?
এমনও যে মনে হয়
কি জানি কখন সমুদ্রের ঢেউ এসে
সবকিছু ভেঙে দেয় অশুভ স্বপ্নের মতন
এ রকম একটা মন কিংবা ঘন কুয়াশার ঝড়
বলয়িত হয় বুকের গভীরে।

শ্বেত পারাবত উড়ে ভোরের শিশিরে
লাল ঘোড়া ছুটে পাহাড়িয়া পথে
দ্বন্দ্বমথিত হৃদয়ে আমার গোলাপের ঘ্রাণ
রজনীগন্ধা তুমি
আমি সেই ছবি এঁকেছি।
আনন্দের এত ঢেউ করতলে কী করে যে রাখবো ?

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

চাষীর গান

ধান কাটি কাটি ধান খালি
আল বাঁধি আর কাটি নালি,
খড় গুঁজি গুঁজি খড় চালে—
দিন চলে চালে আর ডালে।

পাট বুনি বুনি পাট মাঠে
বিনে জল রোদে কাট ফাটে,
বগুনাটা হয় না গাভিন—
হাটে-মাঠে কাটে হাহা দিন।

জাল ফেলি ফেলি জাল খালে
চুনো পুঁটি লাগে যদি ভালে
হাঁস দুটো পাড়ে নাকো ডিম
ফুটো চালে গলে পড়ে হিম

ঘটি-বাটি বাঁধা ঘটি-বাটি
টেনা কানি তাও শতপাটি
মহাজন দেয় সান খুরে—
গলা কেটে পরে চুনি-হীরে।

সেই দিন কবে সেই দিন
ক'রে দেবে ভেদাভেদ লীন,
ভাজাভুজি ছ্যাঁকছোঁক হবে
হেসে-খেলে দিন কেটে যাবে।

বেণু সরকার

সাঁতার বিষয়ক

আজো আমি সাঁতার শিখি নি
চুয়োডাঙার বন্ধুরা সব বিদ্রূপ করে এইজন্যে
অথচ ওদের গ্রামে তেমন কোনো
নদী আছে বলে আমার জানা নেই।

ওরা কেমন দিব্যি সাঁতার কাটে
জল কেটে কেটে চূর্ণী নদীর ওপারে যায়
আমাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করে
সাঁতার জানি না এবং শিখি নি বলে।

কেউ আমাকে শিখিয়ে দিলে না—
জলের ওপর কী ভাবে রাখতে হয় যৌবন
কী ভাবে ছুঁড়তে হয় আড়ষ্ট হাত পা
বিস্তীর্ণ বুক।

কেউ আমাকে শেখালো না সাঁতার
চুয়োডাঙার বন্ধুরা সব বিদ্রূপ করে এইজন্যে
অথচ ওদের গ্রামে তেমন রূপসী কোনো
উদাসীন নদী আমার চোখে পড়ে নি।

গৌতম দাশগুপ্ত

অপরাধী—আটাশ বছর

গুহার ফাটল চুঁয়ে ঝরণার ঝরঝর একটানা
জৈন্ বৌদ্ধ হয়ে আমি দেয়ালে সেঁটেছি আপামর
আটাশ বছর ঐ শব্দ আর ধূসর আধার
নিয়ে যায় ঘুম ঘুম ওদের নৈঋত নিশানায়……

সেখানে প্রাজ্ঞবক আমাকে পাঞ্জায় ডেকে নিয়ে
বলল তুই ফাঁকাপেটে অপরাধী আটাশ বছর
বলল তুই ফাঁকা বুকে অপরাধী আটাশ বছর
আর কবে জেবলে দিবি সহস্রায় অসীম প্রভাত ?

প্রমোদবিকাশ ভট্টাচার্য

প্রতিবিম্ব

মোনালিসার হাসি
ভেনাসের সুডোল স্তন-ভাস্কর্য
সুতন্বী অববাহিকায়
সৃষ্টির মন্দাকিনী
সুপ্ত কুণ্ডলিনী ;

অপবিত্র করো না আমাকে ছুঁয়ে
আত্মমগ্ন হও,
দু'ফোঁটা উষ্ণ চোখের জল
নোনা স্বাদে গড়িয়ে পড়ল আমার হাতে।

কাতর মুহূর্তে সন্নিহিত হই,
তুমি তির্যক হেসে কাছে এলে
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট আদিম মানুষ
আবির্ভূত, তমিস্রায় নতুন—
মুগ্ধ আমি বোবা চোখে দেখি
পুলকিত সত্তার দ্বৈত মিথুন।

সমরেশ মণ্ডল

বিবাহ

ওপরে উঠে দেখে এলাম
তার মুখে উঠে এসেছে একসাথে
রৌদ্র এবং রক্ত
সে শুয়ে আছে সম্পন্ন প্রেমের বিছানায়
বিবাহ বিবাহ
যেন এক মুখ সহাস্য অভ্যর্থনা
পেয়ে যাই অযাচিত অন্য কিছু সুখ
বা ন্যায্য পাওনা

তাকে কী ছুঁয়েছে রঙীন গোলাপী শব্দ
মনে তার কাটাকুটি অজস্র হাতের রেখা
রক্তে সিঁন্দুর গুলে আরো গাঢ় করে
কে লেপেছে তার মুখে
ওপরে উঠে দেখে এলাম
তার মুখে উঠে এসেছে একসাথে
রৌদ্র এবং লজ্জা
সে দাঁড়িয়ে আছে অভিলম্ব সাম্নে ফুলের ঘর
বিবাহ বিবাহ ।।

অমিত চক্রবর্তী

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

যা দিয়েছো সন্ধ্যা হয়ে গ্যালো
দিয়েছো দাওনি সেই আলো
হতে চেয়ে প্রজ্ঞা পারমিতা
নিজেই সাজিয়ে সেই চিতা
পৃথিবীর শ্বাসরোধ করে
হঠাৎই চলে গেলে দূরে
দুরাশা এ নিরাশার আলো
ক্লান্তিকর তবু বড় ভালো

বিনোদ বেরা

অভিমান

তোমার প্রণয়ে পুড়ছি অনুক্ষণ
দুঃখ আমার যদি হে খানিক জানতে
তাহলে অমন দারুণ পথের প্রান্তে
মরুভূমি হয়ে যেতো না হৃদয় মন ।

দ্বিতীয় রম্য বাসভূমি মনে করে
বিশ্রাম নিতে চেয়েছি যখন ক্লান্ত,
আলেয়া স্বভাবে করেছো প্রচুর ভ্রান্ত
জীবন আমার দুই হাতে দৃঢ় ধরে ।

আমার তৃষ্ণাগুলিকে মমতাময়
হে তোমার প্রেমে করো মাধুর্যে সিক্ত
আহা যৌবন অসহ্য লাগে ঠিক তো
দশদিকে গাঢ় প্রখর দুঃসময় ।

হায় কেন আজ বেদনায় ভাঙ বুক
ভীষণ মরুতে বহাও পাগল ঝর্ণা,
অনুগত জনে ওগো কাঞ্চনবর্ণা
ভিখারী করে কি পাও অমূল্য সুখ ।।

গৌরীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

কিছুই থাকে না

শেষবার গঙ্গাযাত্রার সময়ে কিছুই রইলো না
এই তার কোঠাবাড়ি, ধানগোলা, পিছল উঠানে
পায়রার বকম বকম
অনিবার্য সময়ে সে চলে গেছে ।
দরোজার খিল ঘেঁসে তার নান্দীমুখ দেখে
পাড়ার সকলে
দড়িদড়া বাঁশ ও শব্দের ধ্বনি মুখে তৈরী খাটিয়া
একে একে সবই চলে যায় শুধু সম্বল
শুদ্ধ গীতাপাঠ দেহের শুভ্র চাদর ফুলের স্তূপ
মৃত্যুতে শেষ নেই শববাহকেরা হেঁটে যায়
অনিবার্য অশ্রুপাতে নির্বেদ ত্রিবেণী সংগমে !

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

মনে মনে দীক্ষা যার কাছে

মনে মনে দীক্ষা যার কাছে
সে কেন ঈশ্বর হয়ে অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে !

মনে মনে যার কাছে সমর্পণ
সে কি করে নির্বিকার ঠোঁটে হাসি রাখে
সে কি করে সমুদ্রের কাছে নিয়ে
আমাকে গভীর নীল করে দিয়ে দেখে
এখনো সাঁতারে একনিষ্ঠ কি না !
রথের মেলায় ভিড়ে হাত ছেড়ে স'রে দাঁড়িয়েছে
দেখেছে নিঃশব্দ হেসে বাড়ির চৌহদ্দি মনে আছে কিনা।

মনে মনে দীক্ষা তার কাছে
অথচ সে কেন ফের অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে
নিরীশ্বরে রেখে দিতে চায় !

রামপ্রসাদ মল্লিক

নিঃস্ব হয়ে যাও

এত অন্ধকার, তবুও প্রকৃতি
উপহার নিয়ে কার জন্য প্রতীক্ষায়—
আর নয় ! আর নয় !
এবারে নিঃস্ব হয়ে যাও।
অনেক সুখ তো আছে জমা
নরম পাপড়ি ঢাকা
পাহাড়ে, সাগরে, সূর্যোদয়ে
তবুও আকাঙ্ক্ষা কেন ?
নিঃস্ব হও নিঃস্ব হয়ে যাও।

কমলার খোসা হয়ে
ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ গ্লানিটুকু
স্বীকার করো না।
তার আগে নিঃস্ব হও—
নিঃস্ব হয়ে যাও ।।

সৈয়দ হাসমত জালাল

স্বপ্ন ও স্মৃতিমালা—২

ক্রমশ নৈঃশব্দ্যের দিকে সরে যাচ্ছো তুমি
সরে যাচ্ছো স্মৃতির সুদীর্ঘ ছায়া ফেলে
ভালোবাসার দিগন্ত সুদূরে
স্তব্ধতার নদী হয়ে বয়ে যাচ্ছো সুগভীর বুকের প্রদেশে
আর বিষণ্ণ জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে রাশি রাশি স্বপ্নের ফুল

তুমি এ রকম ভ্রূক্ষেপহীন হেঁটে যাচ্ছো কেন
এ কেমন নিদারুণ আত্মমগ্নতা—
দ্যাখো, কী বিশাল প্রতীক্ষার মেঘ জমে যায় বুকের ভিতর
ঠোঁটের উপর ছড়িয়ে পড়ে আকণ্ঠ তৃষ্ণা, নিরুত্তাপ এক একটি দিন
এইসব প্রহরে শুধু নেমে আসে নির্জনতা
প্রাঙ্গন জুড়ে খেলা করে স্মৃতির বাতাস

আমাকে এ রকম নিঃস্বতার মধ্যে রেখে যাচ্ছো কেন
আমি ক্রমশই ভুলে যাচ্ছি সেইসব প্রিয়তম সংগীত
স্বপ্নের শূন্য প্রান্তরে আজ হেঁটে যাই ভীষণ একাকী
স্মৃতির সমুদ্রতীরে শব্দ ছুঁড়ি সুতীব্র চিৎকারে ঃ
অঞ্জুদি, তুমি নৈঃশব্দ্যের দিকে সরে যাচ্ছো কেন···

ইন্দ্রজিৎ বসু

কথা রাখনি

দেড়মাস পর তোমার মুখের দিকে
তাকিয়ে দেখি
তুমি তোমার কোন কথাই রাখনি··· ।
কথা ছিল কি এমন করে কান্না, এমন করে ভুলে থাকার ?
নাকি চলে যাবে জেনে
ক্ষণকাল সেই কথা ভেবে
গোধূলির দিকে বিদায়ের অস্ত্র তুলে ধরো !

কথা ছিল—শেষ বিকেলের ছায়ায়
তোমার নামে আনা ছোট্ট উপহার লুকিয়ে দেব ।

কেন তুমি ভেঙেছো দুঃখে ?
তোমার দুটি চোখ, শুধু ও দুটি চোখ
দেখতে এতদূর ছুটে এলাম ঃ
কিছুই হলো না—তুমি কথা রাখ নি,
দুঃখে-অভিমানে কষ্ট হলো আমার,
চোখেও জল এসেছিল ঃ চোখ সে কথা জানে
তাই আমি
তোমার নরম মুখের চারপাশে এলোমেলো চুলে
ডুবে গেলাম ।

স্বপন চক্রবর্তী

আড়ি ডাকঘরের সঙ্গে

স্বপ্নের ভিতর উড়ে আসছে স্বপ্ন বাতাসের ভিতর বাতাস
অথচ এমন কোন আশ্বাস
ছিল না কোথাও । কেউ বলে নি, 'থাকো
বেঁচে বর্তে থাকো ।'
তার স্টেশন কাঁপিয়ে ছুটে যায় ডাকগাড়ি
যেন জন্মাবধি আড়ি ।

আমার ডাকঘরেরই সাথে ।
তবু বুক পকেটেরই নীচে হাপরের শব্দ জেগে থাকে ।
স্বপ্নের ভিতরে উড়ে এলে স্বপ্ন বাতাসের ভিতর উড়ে এলে বাতাস
গড়ে ওঠে চকমিলা'ন বাড়ী
বিরাট আকাশের জন্য বিরাট ডাক ঘুরি ॥

সুধাংশু বাগ

তোমার উপমা, কালপ্রতিমা

৭

সমস্ত রহস্যমুক্ত, ফুরিয়ে যায় অন্তরালের
অকথিত কথামালা, ফুটে গেলে ফুলের স্বরূপ···
কুসুমরূপসী নারী ! তবু তোমার অনন্ত কথা
থেকে যায় অসমাপ্ত । ব্যবহৃত ভুলের ভুবনে
ফুলের কাহিনী হৃদয়ের দেয়ালে টাঙানো,
অস্থি-মজ্জা-মাংসে ঢুকে অনন্তকাল 'মরচে-পড়া
পেরেকের গান' থেমে যায় তোমার অব্যক্ত সুখে···
তুমি নারী তবু ফুল মানুষের সুখ ও অসুখ ।

জানিতে চায় না কিছু, রূপান্ধ সে, মানস-ভ্রমর
তার প্রার্থিত পরাগ ছুঁয়ে তৃপ্তি চায় আত্মহারা
গর্হিত গুঞ্জনে । তবু থাকে ইতিকথা রমণীর
নিষিক্ত অশ্রুর কাছে । আর সেই প্রণয়পিপাসা
অশ্রুর স্বদেশে হাঁটে । অপার্থিব আনন্দের স্বর
তৃষ্ণা হয়ে ঢেউ তোলে বুকে, মানুষের, বিরহীর···

৮

বিরহ ঝরিয়া যায় আষাঢ়ের ছন্দ অনুষ্টুপে,
বাতাসে বনতুলসী কেঁপে কেঁপে নিঃস্তব্ধ, নিথর,
যেমন কেঁপেছো তুমি করতলে জোয়ার ভাটায়···
শ্রাবণ ঝরেছে একা তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখের পাতায়,

যেমন জানলা-ভরা দিগন্তের উজ্জ্বল আলোক
ডুবে যায় এলায়িত চুলের মেঘময় আঁধারে…
কোথা হতে ভেসে আসে সুর, বিরহবর্ষণ গীতি
উচ্চকিত শোনো তুমি সেই রোরুদ্যমানরাগিণী…

যামিনী তবুও যায়, বনবাসী হাওয়ায় তার
উদাসী চুলের কাছে কার কোমল হাতের ছোঁয়া !
পুষ্পিত পাপড়ি যেন ছড়ায় ছন্নছাড়া সুরভি…
বুকের উঠোনে ফোটে ভুঁই-চাঁপা রোদের প্রভাতী,
নিশীথ-নয়ন ফোটে, যেন ফুল তোমার উপমা,
আর মালাকার ! তোমাকে চয়নে তার অহংকার…

কার্তিক মোদক

কাছারি বাড়ী

বড় বিস্ময় দুরন্ত জলের হাওয়া, বেড় মজুর কাছারির বাড়ী
স্তব্ধ ঘড়ি
ঘরের ভেতর কাঁপছে শরীর
সবুজ ধানের
পাতায় পাতায় কথা
এপার ওপার
নৌকা
মাঝি যাচ্ছে তাড়াতাড়ি
দূরে
কার বাড়ী
এলোমেলো মেঘ রোদ্দুর হাওয়ায়
পাতার বাঁশী বাজছে দক্ষিণ দুয়ারী
স্তব্ধ ঘড়ি
বেড় মজুর কাছারি বাড়ী

বিপ্লব চন্দ

প্রেম

কার কাছে পেতেছো অঞ্জলি ?
সেতো রিক্ত, শূন্য, হাহাকার—পঞ্চশিলা বুকে
পৃথিবীর মানচিত্র থেকে, শ্বাস-প্রশ্বাস থেকে
চলে গেছে আরেক ভূ-লোকে।

বৃথা অন্বেষণ তবু কবরীতে ফুটে উঠে ফুল
বাতাস তবুও আঘাত দেয় মৃত কপাটের ঠোঁটে
হা-আকাশ ! তবুও তোমার ছলাকলা, কে বোঝে—
কোথা দিয়ে মাতাল চোখ, খুঁজে যায়
কিঞ্চিৎ পুষ্প অর্ঘ ; অঞ্জলি
নিঃস্ব কোটি পাঁজরের অনাহূত কান্না।

সবই তো তোমার দান। তোমারই অদ্ভুত সৃষ্টি
কারে তুমি দেবে প্রেম
তুমিই জেনেছো তাঁর বিন্দুমাত্র জ্বালা।

নচিকেতা ভরদ্বাজ

অথচ সে আজ কতদূর

নিরপেক্ষ অব্যর্থ যৌবন
সমস্ত শরীরে তার অনিন্দিত স্বেচ্ছা-স্বাগত
জীবনকে রচনা করে পুষ্পিত প্রমায় ;
ঋষ্যশৃঙ্গ-চেতনায় একদিন অন্ধকারে সর্ব-সমর্পণ
বিলাবলে ঝংকৃত হবেই ঃ এক ক্রম-পরিণত
জীবনের স্বাভাবিক নিয়মের জলদ প্রজ্ঞায়—।
জীবনের এই এক আশ্চর্য উজ্জ্বল সমাচার।
সাম্যবাদী নিসর্গের হাতে কোনো ভেদাভেদ নেই।

সমস্ত রথের চাকা কুরুক্ষেত্রে এসে ভাঙবেই
এবং অতঃপর মহাপ্রস্থানের পথে একদিন উজ্জ্বল উদ্ধার।

তার আগে মরি মরি, অপরূপ জলসায়-সূর্য-সংকীর্তনে
সব অন্ধকার দ্যাখো জ্যোতির্ময় ; সমস্ত দেহের মিনার
রূপরাগে দীপান্বিতা ঃ
ছোট্ট মেয়েটিকে কবে দেখেছিলাম সাতের সিঁড়িতে,
চিনতে পারি না আজ—যৌবনোদ্ধা সম্পন্ন ষোড়শী ঃ
সারা দেহে জ্যোৎস্না মেলে আকাশকে ছুঁয়েছে সঙ্গোপনে,
শিশিরের স্বপ্নস্তোত্র উচ্চারিত মুগ্ধ দুটি চোখের গভীরে,
উদ্দাম জোয়ার দুটি ভরা বুকে থমকে আছে,
চিবুকে, কপোলে ওষ্ঠে আলোর অতসী।
জানুতে, পায়ের গোছে, নিটোল বাহুতে, শুভ্র তরল রূপসী ঘাড়ে
উদাত্ত বর্ণের প্লাবনে
জীবনের রূপকল্প অনিন্দিত হয়ে আছে, আকাশ-নদীর গান
সম্মিলিত শান্তির কোরাসে
অবিরাম অশ্রুত বাজছে, আমি সেই সঙ্গীতের সম্পন্ন মধুর
বুকে ভরে মুগ্ধ শ্রোতা, বসি তার কাছে।
অথচ সে আজ কত দূর।

সন্তোষ দাশ

ইচ্ছে হলে

ইচ্ছে হলে পদ্মপাতায়
টলটলে ঝিম জল
চলকে দিতে পারি,

ইচ্ছে হলে বুকের বিজন
বেহালাটায় ঝড়
ছড় টেনে সঞ্চারী।

ইচ্ছে হলে ঝাউবনে চুপ
শীর্ণ শিখার নদী
নির্দয়তার দানে—,

ইচ্ছে হলে সাজানো সাধ
স্নিগ্ধ সুষম ঘর
ভাসাই ভরা বানে।

কেবল আমার ইচ্ছে হয় না
নয়ন মুদে রাখি
ইচ্ছে হলে অরণ্যে ঘোর
ফাগুন ফুটতো নাকি ?

প্রদীপ রায়চৌধুরী

নিমগ্ন সংলাপ

বারান্দার রেলিঙ ধরে সারাটা বিকেল ঝুলে থাকে বৃষ্টির ফোঁটার মতো
শুদ্ধ ভালোবাসা। ভালোবাসার জন্য স্পর্ধায় চেয়েছিলাম একটি নিশান
যেন নারীর শরীর যার উপর রাখা যাবে আলপনায় নিটোল হাতের
শুধু স্বপ্রেম প্রলেপ যেমন পুজোর উপাচারে চাই অবশ্যই চিত্রল
মঙ্গল কলস যার বুকে রাখা থাকে নিশ্চিন্তে পবিত্র আম্রের পল্লব।
অন্ধকারে নোঙর গেড়ে বিপন্ন বিকেল সূক্ষ্ম কারুকার্যে ধীরে ধীরে
আড়াল দেয় কান্নার কৌতুক, চুনখসা ভ্রূক্ষেপহীন পলেস্তরা
গোধূলির গাঢ় রঙের একমাত্র অলৌকিক আচ্ছাদনে তেমনই নষ্ট
মেয়ের মতো প্রতিদিন নিজেকে সাজায়। পিতা, কেন আমায়
পরিত্যাগ করলে— ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মতন সোচ্চারে বলে উঠলেও
সমস্ত শ্রোতার অকরুণ বধিরতা বালির চরের তৃষ্ণায় পীড়া দেয়।
কষ্ট হয় যখন অসফল স্বপ্নগুলো দূরের পাহাড়ের কৃতঘ্ন কোল ঘেঁসে
ঝাপসা হয়ে পড়ে যেমন কষ্টময় ঘষাচোখে গোলাঘরে
ফসল তোলার পথে অসতর্ক গর্ভিনী স্ত্রীলোক। হিমঘরে রাখা

কোন জীবাশ্মের গভীর বিশ্রামের মতো পাঁজরের দেরাজে একমাত্র ভালোবাসা নাভীর অন্তরালে বহুদিন জেমলে রাখে সুতীব্র কস্তুরীর ঘ্রাণ। অসংলগ্নতায় ঝিলের মমতা নিয়ে বুকের গভীরে সংলগ্ন প্রিয় শব্দের ঢেউ-এ কাঁপে বিলীন বিশ্বাস। জাফরানি সমস্ত মেঘের আদলে সন্ন্যাসীর শোকে আচম্বিতে স্থির হয় গাঢ়তম সন্ধ্যায় হ্রদের জলের জমাট দুঃখের মতো নিমগ্ন সংলাপ।

শিশির ভট্টাচার্য

প্রতিদিন এইভাবে

আজন্ম মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ালড়ি করে
বেঁচে থাকা ; যার নাম লড়াকু জীবন।
পেছনে বাঁকের মুখে, অন্ধকারে ফেলে আসা
মন ; যেন সারাক্ষণ খোঁচা দেওয়া
বিবেক নামক বেয়াড়া বেমক্কা একজন—
প্রহরীর মত সঙ্গে নিয়ে চলা,
হাতে যার ঝকঝক বর্শার ফলক
'পাপের বেতন মৃত্যু' এই কথা বারে বারে
মনে করে দিতে। যদিও নিভৃতে
হৃৎপিণ্ডের অলৌকিক স্রোতে
পাকদণ্ডী বেয়ে নামে দেহাতী বাসের মতো
আলোড়িত স্বেদসিক্ত স্মৃতি ;
কিছু প্রেম-প্রীতি, অতৃপ্ত কামনাগুলি
ছুঁড়ে দেওয়া সবুজ পাহাড়ে॥

প্রতিদিন এইভাবে দর্পণের মুখোমুখি
মানে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ আদি ষড়রিপু
এবং বঞ্চনার সঙ্গে বোঝাপড়া, আত্মসমীক্ষণ
এবং মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ালড়ি, বেঁচে থাকা
এরই নাম লড়াকু জীবন॥

বিদেশী কবিতা :

আমেরিকা

এমিলি এলিজাবেথ ডিকিনসন

(১৮৩০—১৮৮৬)

[আজ থেকে একশো পঁয়তাল্লিশ বছর আগে মহিলা কবি এমিলি ডিকিনসন ম্যাসাচুসেট্‌সের ছোট্ট উপত্যকা আমহার্স্টে পৃথিবীর আলো দেখেন। এমিলির মনে প্রথম ছন্দের দ্যোতনা আনে তাঁর বাড়ির সংগ্রহে রক্ষিত ধর্মপুস্তকের স্তোত্র সঙ্গীত। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতা 'A Valentine'। যে মৃত্যু মানুষের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ব্রাউনিং-এর মত এমিলিও তাকে ঘৃণা করতেন। তাঁর নিজের ভাষায়—'মৃত্যু নিজের কাছেই বাধা, পরিবর্তনের হাত থেকে মুক্ত।' প্রকৃতিকে আমরা যে ভাবে দেখি সে তাই। তার জন্য শিল্পকে গড়ে তোলা সম্ভব নয়, শিল্পই প্রকৃতিকে অনুকরণ করে, কারণ তার সরলতার কাছে আমাদের বিদ্যা পরাভূত। স্বচ্ছ সুন্দরতম ভাষার লাবণ্যে এমিলি ডিকিনসন এ যুগের পাঠকের মনেও তরঙ্গিণী।]

১ আকাশ অগভীর, মেঘেরা হীন

আকাশ অগভীর মেঘেরা হীন
গোলাবাড়ি পেরিয়ে
কি একটা খাতের মধ্য দিয়ে
একাকী ভ্রাম্যমান তুষারের একটা পাপড়ি
চলে যাবেই কি যাবে না ভেবে
নিজের সাথে তর্কে দোলে—

স্বার্থপর এক বাতাস
কে কবে তার সাথে কেমন ব্যবহার করেছে
এই নালিশ জানিয়ে যায় সারাদিন—
প্রকৃতিও আমাদের মত অবস্থায়
কখনো ধরা পড়ে যায়
যখন তার মাথায় থাকে না রাজমুকুট।

২ আলো কিছু ঝুঁকে আছে

শীতের বিষণ্ণ বিকেলের পিঠে
আলো কিছু ঝুঁকে আছে
গীর্জার স্বরে যতটুকু ভার
ততটুকুই তার অত্যাচার

সে আলোর নন্দন আঘাতে
কোন চিহ্ন রাখে না ক্ষত
শুধু অন্তর্লীন উদাসীনতায়
তার ইঙ্গিত গান গায়

তার শিক্ষা কার হাতে—
সে নিশ্চিত নৈরাশ্যের সীলমোহর
যন্ত্রণার মাঝে আনে রাজকীয় গরিমা
তার আমাদের ফাঁকে বাতাস মধ্যমা

স্থিরচিত্র মাটি তার আগমনী শোনে
ছায়ারা ধরে রাখে নিঃশ্বাস
যখন সে চলে যায় সে যেন সুদূর
মৃত্যুর মুখের মত নিঃসীম বিধুর

অনুবাদঃ দেশ ভাটিয়া

ম্যারগারিতা আলিয়ার

[ম্যারগারিতা আলিয়ার রুশ মহিলা কবি। অতি পরিচিত শব্দ ও ঘটনা নিয়ে কবিতা লেখেন—অনেকটা কথা বলার ভঙ্গীতে। এদিক দিয়ে শুধু রুশ সাহিত্যেই নয় বিশ্বসাহিত্যেও তিনি স্বতন্ত্র।]

ভাগ্যবান দু'জন

তারা ঝগড়া করেছিলো ট্রামে আবার।
ভীড়ের কথা ভুলে, তারা বাষ্প উদ্গার করেছিলো।
কিন্তু আমি, আমি তাদের খোলাখুলি হিংসা করেছিলাম
যেহেতু, গভীরভাবে আলোড়িত আমি, দেখেছিলাম দৃশ্যটা।

সবচেয়ে ভালো এটাই যে তাদের কোন সংশয় ছিলো না
এবং জানতো না কি রকম ভাগ্যবান তারা।
যে তারা দু'জনই সজীব
এবং এখনও পারে তাদের অসুখগুলি দূর করতে।

অনুবাদঃ শ্রীঅসিত সরকার

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে ঃ

হিন্দী

সুবাস কুমার

[ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিন্দীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। বিভিন্ন চাকরীর পর বর্তমানে আসানসোলের একটি সরকারী কলেজে হিন্দী বিভাগের প্রধান। বিহারের প্রতিনিধিস্থানীয় তরুণ কবিদের মধ্যে সুবাস কুমার একজন। 'ধর্মযুগ', 'সাপ্তাহিক হিন্দুস্থান' প্রভৃতি প্রখ্যাত হিন্দী পত্রিকায় নিয়মিত লিখে থাকেন।]

একটি সুন্দর ঋতুর জন্য

রোদ্দুরের খেলা চলে সারাদিন ; কোথাও বা ছায়া ফেলে,
কোথাও আবার সে দৃশ্যমান হয়—
এ ঋতুর কোনো স্থিরতা নেই ;
দেখ
সানগ্লাস চোখে দিলে চতুর্দিকে মেঘ
অথবা প্রখর দুপুরে চলে আতপ্ত হাওয়া ;
এ ঋতু চঞ্চল, এ ঋতু ব্যাধিময়
দৃশ্যান্তর কখনো বা হয়, কখনো আবার সে তীব্র জ্বালাময়ী
অন্ধকূপের মতো সমস্ত পরিবেশ মৌনতায় ভরা
প্রত্যেকটি লোক অপেক্ষমান এখন

একটি সুন্দর ঋতুর প্রতীক্ষায় ।।

অনুবাদ—আনন্দ দাশগুপ্ত

হিন্দী

ধুমিল

[কবি ধুমিল-এর আসল নাম সুদামা পাণ্ডে। আধুনিক হিন্দী কবিতার জগতে শীর্ষস্থানীয় কবি।]

ওর জানা আছে

ওর জানা আছে
শব্দের জন্যে কত অবয়ব নগ্ন হয়েছে,
হত্যায় মানুষের আর রুচি নেই,
এটা অভ্যাসে পরিণত,
সে কোনো গেঁয়ারের ক্ষ্যাপামীতে
জন্মে এবং একজন ভদ্রসন্তানের
মত, যে লেখাপড়া জানে
তার সাথে, শহরের বাসিন্দা '
পূর্ণ নারী হবার আগে সমস্ত ক্রিয়া-
প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাবার সময়
ও জানতে পারে—ভালবাসা—
ঘিঞ্জি বস্তির মধ্যে কোনো পাকা-
দালানের সন্ধানমাত্র।
আর
ক্রমাগত বর্ষায় ভিজতে ভিজতে
ও জেনেছে যে প্রতি রমণী
তৃতীয় গর্ভপাতের পর ধর্মশালা
হয়ে যায়।
আর কবিতা
প্রতি তৃতীয় পাঠের পর।

অনুবাদ—সমীর চক্রবর্তী

● আলোচনা

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় নতুন লিখছেন। তবে হাত নতুন নয়। কবিতাগুলি গদ্যছন্দ হলেও বেশ ছন্দোবন্ধ পড়তে কোন অসুবিধা হয় না। কিছু কিছু কবিতায় কবি গভীরে যেতে চেয়েছেন সহজ সরল ভাষায়। মানুষের আর্তি বেদনা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এইখানেই কৃতিত্ব তাঁর শব্দের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। কবি বলেছেন—সিঁড়িগুলো ভাঙছি তো ভাঙছিই/কতবার মনে হ'ল সামনের সিঁড়িটাই বুঝি শেষ ধাপ। তারপর সব শেষ—মুক্তি। অথবা গহন অরণ্যভূমি/নিবিড় সান্নিধ্য পায়/আকাশের। বেশ জোরের সংগে নিজের আর্তি প্রকাশ করেছেন। অন্য এক কবিতায় বলেছেন—এখন অপেক্ষা নয়/নয় কোন দ্বিধা ও সংশয়/এখনই সাহায্য চাই/অস্ত্রে অর্থে ঔষধে, লোকবলে/এখন সিদ্ধান্ত হবে/লৌহ দৃঢ় কঠোর প্রত্যয়। রাজকুমার মুখোপাধ্যায় কবিতা লিখতে জানেন। আশাকরি সর্বস্তরের পাঠকদের ভাল লাগবে তাঁর কবিতা। কবিতাগুলোর মধ্যে সেই প্রত্যাশা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

—অশোক মণ্ডল

শব্দের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে | রাজকুমার মুখোপাধ্যায় | একক প্রকাশনী, ১০/৩ সি, নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীট, কলিকাতা-২৬।

২

এই তো কিছুদিন থেকে নির্মল বসাকের কবিতা লিট্‌ল ম্যাগাজিনে দেখছি। কবিতাও পড়েছি তবে তেমনভাবে মনে দাগ কাটেনি এখনও। নির্মল বসাকের প্রথম কবিতার বই 'নৈঃশব্দ্যের অনুভব'। 'নৈঃশব্দ্যের অনুভব' কবিতাটি দীর্ঘ। এই কবিতাটি ও আরো ৬৩টি কবিতা রয়েছে এই সংকলনে।

কবিতা পড়তে আমার সব সময়ই ভাল লাগে। কবিতার বই পেলে তো কথাই নেই। কবিতাগুলি পড়ে মনে হয়েছে, অতীত স্মৃতি কবিকে সর্বক্ষণ ঘিরে রেখেছে। এবং তার সংগে নিজের আপেক্ষিক দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে রয়েছে। এই স্মৃতিচারণ পড়ে মনে হয় কবি প্রকৃতি-প্রেমিক। এক অর্থে রোমান্টিক। 'নৈঃশব্দ্যের অনুভব' কবিতা থেকে দুটি লাইন তুলে দিচ্ছিঃ তোমার স্বপ্নের সুখে তুমি আঁকো চিত্রালী আড়াল। তুমি গড় কুঞ্জ ও নিকুঞ্জ আর সাঁকো পথ প্রাসাদ মিনার। সহজ সরল শব্দ অথচ মনের মধ্যে দোলা দেয়। কবি এইখানেই সার্থক এবং কবিতা প্রেমিকদের তৃপ্তি দিতে পেরেছেন। আরো আছে, যেমনঃ নীল ধুতুরা নিয়ে তোমার প্রিয় খেলা সারাদিন/আমার বাগানে তাই সহস্র বীজ পুঁতে দিয়েছি। [প্রতিধ্বনি ফিরে আসেই] এই রকম বহু কবিতার লাইন বইটিতে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রতিটি কবিতায় একই সুর। কবি বুঝি এই সুর থেকে অন্য সুরে যেতে চান না। তবে এ কথা বলবো কবিতাগুলি কবিতা হয়েছে। কবিতার পাঠক এই কাব্যগ্রন্থটি সহজেই গ্রহণ করবেন। আগামীতে নিশ্চয়ই নির্মল বসাকের কলম অন্য সুরে বিচরণ করবে। হাতটা বেশ মিষ্টি। প্রতিটি কবিতা সহজ সারল্যে ভরা। এটা ভাল কি মন্দ তা পাঠকদের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

—বরুণ মণ্ডল

নৈঃশব্দ্যের অনুভব | নির্মল বসাক | বসন্ত লাইব্রেরী ২২/১, বিধান সরণী, কলকাতা-৬ | মূল্য—চার টাকা।

৩

বাংলাদেশের পাঠক সম্প্রদায়ের মন পড়ে থাকে গল্পের দিকে। সাহিত্যের বাজারে গল্প-উপন্যাসই বেশী চালু। বড়ো বড়ো নামী পত্রপত্রিকাগুলিতে কবিতার জন্য দু পৃষ্ঠার বেশী জায়গা নেই কেন এর উত্তরে সম্পাদক মশাইরা হয়তো বলবেন ভালো কবিতা আজকাল কজনই বা লিখছে বা লেখার চেষ্টা করছে? কথাটা অর্ধসত্য। ভালো কবিতা অনেকেই লিখছেন কিন্তু পাঠকদের দৃষ্টি থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু একেবারে সরিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না কোনভাবেই। সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদিত 'সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা'র সংকলনখানা হাতে নিয়ে সেই কথাই মনে পড়ল। এই সংকলনে নবীন প্রবীণ মিলিয়ে ৬৪ জনের কবিতা ঠাঁই পেয়েছে। নামীদের মধ্যে দিনেশ দাস, মণীন্দ্র রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শিশির ভট্টাচার্য, ফণিভূষণ আচার্য, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, প্রমুখেরা আছেন তেমনি প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন তরুণ কবিদের মধ্যে সুনীল হাজরা, জীবন সরকার, কুমারেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকের কবিতা স্থান পেয়েছে। তরুণতর কবিদের সম্পর্কে সম্পাদক-সংকলকের স্বীকারোক্তি "এখানে অনেকেই আছেন যাঁরা অল্পদিন হলো লিখছেন। বয়স ও অভিজ্ঞতা অল্প এবং এখনো পর্যন্ত এই জাতীয় কাব্যগ্রন্থে স্থান পান নি অথচ কবিতায় যথেষ্ট আন্তরিক।" এই রকম সংকলন আরো হলে ভাল হয়। সম্পাদককে ধন্যবাদ জানাই।

—পান্নালাল সরকার

সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতা | সম্পাদনা ঃ সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া প্রকাশনী, কলকাতা-৬০। দাম—চার টাকা।

৪

সব কবির কবিতা পড়া যায় না, কেউ কেউ পড়িয়ে নিতে পারেন, যাঁরা পারেন তাদের কেউ কবি বলতে দ্বিধা করে না। অন্তত কবিতার পাঠক হিসাবে আমার তাই অভিমত, যেহেতু কবিতা লেখা নাকি খুব সহজ। বর্তমানে এই রকম একটা অভিমত আবার নতুন করে দানা বেঁধে উঠছে। কেননা কবিতার পাঠক নাকি কবিরাই। তবু কবিতার বই ছাপা হয় এবং তা পড়ে কবিরাই চিৎকার চেঁচামেচি করেন অর্থাৎ কিনা কবিরাই এখন পর্যন্ত সজীব মনকে বিসর্জন দিতে পারেন নি। বোধহয় কেউ পারেন না। কবিরা সার্থক হয়ে উঠতে চাইছেন, এই অসহনীয় জীবন যন্ত্রণা থেকে তাঁরাই এখনো সোচ্চার হতে চাইছেন। এইখানেই সার্থকতা। কবি সমীর চট্টোপাধ্যায়-এর 'সূর্য প্রদক্ষিণে তোমার ছায়া' কবিতার বইটি পড়ে আবার নতুন করে মনে হলো, তাঁর একান্ত স্বনির্ভর উচ্চারণ চমকিত করে, ভাবিত করে মুগ্ধ করে। আর কতদূরে যাব/

পথগুলো একে একে এসে/হয়েছে দুরন্ত খরস্রোতা নদী/হ্যাঁ সবাই যখন সেই খরস্রোতা জীবন নদীর দিকে স্থির তখন কবিকণ্ঠ স্থির থাকতে পারে না, জীবনের দুঃখকষ্টের মধ্যে তিনি পথ করে নেন, প্রাণের ভিতর প্রাণ,/শব্দের ভিতরে শব্দ/অবিশ্বাস্য হাসি হেসে বলে আমরা স্বাধীন/উপরের বারান্দা থেকে বুক্ষের শ্যামল বাহু মুক্তিকায়/অনেক গভীর থেকে রস শুষে নেয়। বেঁচে থাকবার জন্য জীবনের এই যে যন্ত্রণা, এই যে সংগ্রাম তা কী কখনো ব্যর্থ হতে পারে! তার জন্যই তো কবিদের সংখ্যা বেশী; কেননা তাঁরা নানা প্রান্ত থেকে দাঁড়িয়ে মানুষের মুক্তি কামনা করছেন, মানুষের মানসিক মুক্তির দাবী তুলছেন। সেইজন্যই বোধহয় কবির সংখ্যা বেশী, বেশী হতে বাধ্য, কবিতা যে এই দুর্দিনে এখনো প্রাণবন্ত হয়ে বেঁচে আছে সবাইকে বেঁচে উঠবার তাগিদ দিচ্ছে, একথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। সে তাগিদ পেয়েও যখন আমাদের ঘুম ভাঙে না, তখন সেই অশুভ ছায়ার হাতকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেয়েছেন সমীরবাবু এবং তাঁর দেওয়ার মধ্যে কোন ফাঁক বা ফাঁকি নেই। সেইজন্য তাঁর কবিতা বইটি পড়ে আমরা খুশি হই আনন্দিত হতে পারি। আর পারি বলেই তাকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

—সুনীল হাজরা

সূর্য প্রদক্ষিণে তোমার ছায়া | পরিবেশক ঃ লেখাপড়া ১৮/৫বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ | মূল্য—চার টাকা

পশ্চিম দিনাজপুর

হরিশ দেবনাথ—দীর্ঘদিন ধরে কাব্যচর্চা করছেন। গদ্য ও ছন্দোবন্ধ কবিতায় পারদর্শী। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে।

রাধামোহন মোহান্ত—প্রবীণ কবি। দীর্ঘ দিন ধরে নিরলসভাবে কাব্যচর্চা করে চলেছেন। কবির সম্পাদনায় বালুরঘাট থেকে 'আত্রেয়ী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সুদীর্ঘ ক'বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে।

শিশির গুহ—কবিতায় মিষ্টি হাত। এপার বাংলা ও ওপার বাংলার অসংখ্য পত্রিকায় কবিতা লিখেছেন। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে। নিতান্ত অপরিচিত জনকে এক মুহূর্তে আপন করে নেবার মতো ক্ষমতা কবির করায়ত্ত। আবৃত্তির কণ্ঠটিও চমৎকার। দৌলতপুরে বাস করেন। উত্তরবঙ্গ যুব সাহিত্য সংসদের সাধারণ সম্পাদক। 'উৎসব' নামে একটি উন্নতমানের পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

নীরদ রায়—পশ্চিম দিনাজপুর তথা উত্তরবঙ্গের অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিপূর্ণ কবি। জীবনধর্মী কবিতা লিখতে ভালোবাসেন। সম্প্রতি ওঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অন্যমুখ ঃ আবরক আকাশ' প্রকাশিত হয়েছে।

মুকুল বসু—কবিতার হাতটি চমৎকার। গত বেশ ক'বছর ধরে কাব্যচর্চা করে আসছেন।

হরিদাস মৈত্র—সাংসারিক প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও প্রবীণ কবি প্রতিদিন একটি করে কবিতার ফসল উপহার দিয়ে যাচ্ছেন। 'অভিযান'-এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়—পশ্চিম দিনাজপুরের কাব্য-আন্দোলনের প্রধান মাসিক কবিতা পত্রিকা 'স্পন্দন'এর অন্যতম সম্পাদক। বালুরঘাটে থাকেন।

কান্তি সিংহ—প্রবীণ কবি কাব্যচর্চাকে জীবনের অন্যতম ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পথিক' প্রকাশিত হচ্ছে।

শরচ্চন্দ্র চাকী—গত ১২ এবং ১৪ বছর ধরে কালীয়াগঞ্জ থেকে কবির সম্পাদনায় 'খাঁটি কথা' ও 'খাঁটি সেবক' নামে দুটো কবিতাপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ।

রাধারমণ দাশ—দীর্ঘদিন ধরে বালুরঘাট থেকে কাব্যচর্চা করছেন। 'শঙ্খ' পত্রিকার সম্পাদক।

তপনকুমার চক্রবর্তী—কবির সম্পাদনায় গত সাত বছর ধরে 'কোলকাতা সড়ক' নামে একটি মাসিক সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

পল্লব দাশগুপ্ত—রায়গঞ্জ কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক। 'নিশান' পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি।

কিরণগোপাল দে সরকার—এঁর সম্পাদনায় বেশ ক'বছর ধরে করণ দীঘি থেকে 'চেতনা' নামে একটি সাহিত্য সংকলন প্রকাশ হচ্ছে। প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম ঃ 'অনেক মন একটি সূর্য।'

কুমার দেব—অন্যতম প্রতিশ্রুতিপূর্ণ কবি। রায়গঞ্জে থাকেন।

স্বপন মজুমদার—তরুণতম কবি। দীর্ঘদিন ধরে ওঁর সম্পাদনায় রায়গঞ্জ থেকে 'তরঙ্গ' নামে একটি সাহিত্য সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে।

গোপাল লাহা—গদ্য কবিতা লেখেন। মধুপর্ণীর সহ-সম্পাদক। বালুরঘাটে থাকেন।

ব্রততী ঘোষ রায়—কবিতার হাতটি মিষ্টি। রায়গঞ্জ কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপিকা।

সরিৎ ভোকদার—বালুরঘাট থেকে নিয়মিত কাব্যচর্চা করে আসছেন। এঁর সম্পাদনায় 'চেতনা' কাব্য সংকলন প্রকাশিত হোয়েছে।

অনিন্দ্যনারায়ণ মজুমদার—দীর্ঘদিন ধরে বালুরঘাট থেকে কাব্যচর্চা করে চলেছেন।

ধনঞ্জয় রায়—নিয়মিত কাব্যচর্চা করেন। 'কালীয়াগঞ্জ বার্তা'র সম্পাদক। কাব্যগ্রন্থের নাম ঃ 'দেবদারু বনে আগুন'। কালীয়াগঞ্জে থাকেন।

অচিন্ত্যনারায়ণ মজুমদার—বালুরঘাট থেকে প্রকাশিত সাহিত্য মাসিক 'সঞ্চারিণী'র সহ-সম্পাদক।

জনার্দন বর্মা—'ধ্রুব' সাহিত্য সংকলনের সম্পাদক। শিক্ষকতা করেন। রায়গঞ্জে থাকেন।

শ্যামল গাঙ্গুলী—কবিতাঅন্ত প্রাণ। ও'র প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মানসী'।

শ্রীচরণ দাশ—আসল নাম ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। ছন্দোবন্ধ কবিতা ও ছড়া লিখে থাকেন।

পীযূষকান্তি ভট্টাচার্য—অনেকদিন ধরে কবিতার রাজ্যে বিচরণ করছেন। ইতিপূর্বে 'কৃন্তন'এর সহ-সম্পাদক ছিলেন।

শ্রীকান্ত—আসল নাম জয়নারায়ণ সাহা। গদ্য ও ছন্দোবন্ধ উভয় বিভাগেই দখল রয়েছে। 'অভিযান'-এর যুগ্ম সম্পাদক।

তপনকিরণ রায়—'অভিযান' পত্রিকার সম্পাদক। কবিতা ও গল্প লিখে থাকেন।

———

মাননীয়

সম্পাদক, 'অন্যদিন'

কিছুকাল হল আমি একটা পাবলিসিটি ফার্মে' কাজ করছি। যখন বেকার ছিলাম, তখন ঠেসে কবিতা লিখতাম। অনেক পত্রিকায় আমার লেখা ছাপাও হয়েছে। অনেক লেখা অনেক সম্পাদকের দপ্তরে হারিয়েও গিয়েছে। লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিন সম্বন্ধে তখন বেশ শ্রদ্ধা ছিল, তার উপর মায়াও ছিল। সত্যিই তো, কত কষ্ট করে এইসব পত্রিকা বের করা হয়। এইজন্যেই হারিয়ে যাওয়া লেখার জন্যে কষ্ট পেলেও সেইসব কাগজের উপর রাগ হয় নি।

এখন আর কবিতা লেখার সময় পাচ্ছিনে। এখন বিব্রত আছি অন্য কাজে। বিজ্ঞাপন বিতরণের কাজে।

লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিনদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে অনেক কুমীরকে চোখের জল ফেলতে দেখেছি। এখনও দেখছি অবশ্য। এখন আমিও বুঝতে পারছি সব লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিন আসলে কিন্তু লিট্‌ল ম্যাগাজিন নয়। সামান্য দশ-বারো বা বিশ পাতার কাগজ বলেই কি তা লিট্‌ল্‌? লিট্‌ল্‌ বলতে অবশ্য অন্য কথা বোঝায়। তাই এসব পত্রিকাকে বলতে চাই স্মল, বলতে চাই ইনসিগনিফিকান্ট।

লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিন নিয়ে অনেক লেখালেখি দেখছি আজকাল। এইসব পত্রিকা বাঁচিয়ে রাখার জন্যে অনেক তদ্বির আর তদারক করা হচ্ছে উচ্চমহলে। সে সব মহল থেকে শেষ পর্যন্ত যদি আনুকূল্য পাওয়া যায় তখনও দেখা যাবে নেপোরাই দই মেরে যাচ্ছে। প্রকৃত লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিন যেমনকার তেমনি পড়ে থাকবে।

প্রকৃত লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিন হচ্ছে ভালোবাসার জিনিস, নেশার জিনিস। আত্মসুখের বা পেশার জিনিস নয়। সুখে থাকার ও স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার জন্যে এ লাইনে না নামাই ভালো।

কেউ-কেউ দেখি, কার্ডে' কবিতা ছেপে বিলি করেন—এও এক নেশা। কেউ-কেউ হ্যাণ্ডবিলের মতন করে কাব্যপত্র ছাপেন—এটাও এক ভালোবাসা। এ সবের তারিফ করি।

আজকাল বিস্তর পত্রিকা ঘেঁটে দেখার সুযোগ পাই। কোনো-কোনো পত্রিকা বেশ উঁচুদরের, বেশ ছিমছাম, বেশ মার্জিত, বেশ সুরুচিসম্পন্ন। এসবে হয়তো দু-চার পাতা বিজ্ঞাপন আছে। খরচ ওঠে কিনা বলা শক্ত। কোনো-কোনো পত্রিকা যেমন-তেমন ভাবে ছাপা, কিন্তু বিজ্ঞাপনে ঠাসা। এগুলো কিন্তু নেশার কাগজ নয়, পেশার কাগজ। মনে হয়, দশ-বারো পাতা যে রীডিং ম্যাটার থাকে, তাই অনেকগুলো সংখ্যায় আলাদা আলাদা বিজ্ঞাপনসহ বের করে দেওয়া হয়। এবং দাবী করা হয় কয়েক হাজার সারকুলেশন। অথচ হয়তো পঞ্চাশ কপিও না।

লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিনে ভেজাল ঢুকেছে দেখে বেশ মজা লাগছে। লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিনের মানমর্যাদা বলে যদি কিছু থাকে তা তবে এঁদের কৃপায় খর্ব হয়ে যাবে। আমাদের কি সাবধান হওয়া উচিত নয়।

আমার নামটা ছাপবেন না। নীচে যে নাম দিলাম সেইটেই ছাপুন।

ইতি—
ভবদীয়
দিগন্ত সমঝদার

কবিতায় নোবেল পুরস্কার

প্রখ্যাত বর্ষীয়ান ইতালিয়ান কবি ইউজেনিও মনতালে এ বছর তাঁর কাব্য-কৃতির জন্যে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন। আমরা তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নরেনদা নেই। কথাটা বিশ্বাস করা শক্ত ছিল। এই সেদিন আমরা কজন মিলে বেশ কিছুক্ষণ বসে গল্প করছিলুম নরেনদার সঙ্গে, চোখের উপর ভেসে উঠলো। সেই সঙ্গে মনে হলো বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের সম্ভবত শেষ প্রতিনিধি। চেনা মহলের সেই জীবন নিভে গেল।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র কথা-শিল্পী হিসাবেই প্রখ্যাত হলেও নরেনদা কিন্তু কবিতা লিখতেন প্রথম জীবনে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সংগে যুগ্মভাবে কবিতার বই বেরিয়েছিল।

এই সেদিন নরেনদাকে 'সরোজ রায়চৌধুরী' স্মৃতি পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করলো সরোজ সাহিত্য পরিষদ।

সুকান্ত জন্মোৎসবে সাহিত্য সভা

বর্ধমানের নুরকণায় স্থানীয় সাপ্তিক পত্রিকার উদ্যোগে গত ১৭.৮.৭৫ তাং সুকান্ত জন্মোৎসবে এক সাহিত্যসভার আয়োজন করা হয় বুদবুদ কমার্সিয়াল ইনসটিটিউট হলে বিকাল ৫টায়। ঐদিন একই সঙ্গে সাপ্তিক পত্রিকার অফিস উদ্বোধন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অরুণ প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সুকান্তের প্রতিকৃতিতে মালা দেওয়া হয়। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন পূরবী মজুমদার ও সুনীল সিংহরায়। সুকান্তের কবিতা পাঠ করেন পূরবী মজুমদার, চিত্তরঞ্জন পাল, আনন্দ গোস্বামী। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন প্রদীপ কুণ্ডু। সাহিত্য আলোচনা করেন সুরজিৎ মুখোপাধ্যায়, মনোজ ঘোষ ও সাপ্তিক সম্পাদক পঙ্কজ সিংহ।

মানসলোক

দুবরাজপুরে 'মানসলোক' পত্রিকার উদ্যোগে কবি সম্মেলন হয়ে গেল। কবিতা পাঠ করলেন জয়ন্ত চক্রবর্তী, তাপস ওঝা, সমরেশ মণ্ডল, অনুপম দত্ত এবং আরও অনেকে।

কবিশেখর কালিদাস রায়

অশীতিপর কবি, কবিশেখর কালিদাস রায় পরলোকগমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলার কাব্যক্ষেত্রে একজন দিকপাল অন্তর্হিত হলেন।